শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য

(চরিতাংশ)

জন্মলীলা। ১৪০৭ শকের ফাল্গুন মাসে পূর্ণিমা-তিথিতে সন্ধ্যাসময়ে শ্রীমন্ মহাপ্রভু জন্মলীলা প্রকটিত করেন। সে দিন চন্দ্রগ্রহণ হইয়াছিল; গ্রহণোপলক্ষে নবদ্বীপ শ্রীহরিনাম-কীর্ত্তনে মুখরিত হইতেছিল; গঙ্গার ঘাটে শত শত লোক হরিনাম করিতে করিতে গ্রহণ-স্নান করিতেছিলেন। ঠিক এমন সময়ে সঙ্কীর্ত্তনের মধ্যেই সঙ্কীর্ত্তন-নাটুয়া শ্রীমন্ মহাপ্রভু নবদ্বীপের মায়াপুরে সদ্যোজাত শিশুরূপে অবতীর্ণ হইলেন। তাঁহার পিতার নাম শ্রীজগন্নাথ মিশ্র, মাতার নাম শ্রীশচীদেবী।

জগন্নাথ-মিশ্রের জন্মস্থান ছিল শ্রীহট্ট-জেলার অন্তর্গত ঢাকাদক্ষিণে। বিদ্যাশিক্ষার নিমিত্ত তিনি নবদ্বীপে আসেন এবং পরে নীলাম্বর-চক্রবর্ত্তীর কন্যা শচীদেবীকে বিবাহ করিয়া নবদ্বীপেই বসতি স্থাপন করেন। ক্রমে শচীদেবীর আট কন্যা জন্মগ্রহণ করেন, আট কন্যাই দেহত্যাগ করেন। পরে বিশ্বরূপের এবং তাঁহার পরে শ্রীমন্ মহাপ্রভুর জন্ম হয়। কেহ কেহ বলেন, শ্রীমন্ মহাপ্রভু একটী নিম্ববৃক্ষ তলে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন বলিয়া শিশুকালে তাঁহাকে নিমাই বলা হইত; কিন্তু কবিরাজ-গোস্বামী বলেন—"ডাকিনী শাকিনী হৈতে, শঙ্কা উপজিল চিতে, ডরে নাম থুইল নিমাই॥ ১।১৩।১১৬॥"

অতি অল্প বয়সেই বিশ্বরূপ পরম বিদ্বান্ এবং ধর্ম্মপ্রবণ হইয়া উঠিলেন। তাঁহার বয়স যখন প্রায় ষোল বৎসর, তখন জগন্নাথমিশ্র তাঁহার বিবাহের বন্দোবস্ত করিতেছিলেন। এমন সময় বিশ্বরূপ হঠাৎ একদিন গৃহত্যাগ করিয়া সন্ন্যাস গ্রহণ করিলেন। শোকে দুঃখে পিতামাতার হৃদয় বিদীর্ণ হইয়া গেল; প্রাণের নিমাইকে বক্ষে ধারণ করিয়া তাঁহারা কোনও রূপে জীবন রক্ষা করিলেন।

বিদ্যারম্ভ ও অধ্যয়ন-ত্যাগ। যথাসময়ে নিমাইয়ের বিদ্যারম্ভ হইল; গঙ্গাদাস-পণ্ডিতের টোলে তাঁহাকে ভর্ত্তি করিয়া দেওয়া হইল। লেখা-পড়ায় তাঁহার অনন্য-সাধারণ উন্নতি ও প্রতিভা দেখিয়া সকলেই বিস্মিত হইলেন। কিছু দিন পরেই বিশ্বরূপ যখন সন্ন্যাস-গ্রহণ করিলেন, তখন নিমাইয়ের জন্য মিশ্রবরের উৎকণ্ঠা হইল। লোকে যতই নিমাইয়ের অসাধারণ প্রতিভা, সুতীক্ষ্ণ বুদ্ধি, এবং অধ্যয়ন-পটুতাদির প্রশংসা করিত, মিশ্রবরের উৎকণ্ঠা ততই বৃদ্ধি পাইতে লাগিল; একদিন তিনি শচীদেবীকে বলিলেন—

"এই পুত্র না রহিবে সংসার ভিতর॥ এই মত বিশ্বরূপ পড়ি সর্ব্বশাস্ত্র। জানিল সংসার সত্য নহে তিল মাত্র॥ সর্ব্বশাস্ত্র-মর্ম্ম জানি বিশ্বরূপ ধীর। অনিত্য সংসার হৈতে হইলা বাহির॥ এই যদি সর্ব্বশাস্ত্রে হৈব জ্ঞানবান্। ছাড়িয়া সংসার-সুখ করিবে পয়াণ॥ * * * * পড়িয়া নাহিক কার্য্য বলিল তোমারে। মূর্খ হই পুত্র মোর রহু মাত্র ঘরে॥—শ্রীচৈতন্য ভাগবত।" নিমাইয়ের পড়া বন্ধ হইল। নিমাই মনে বড় দুঃখিত হইলেন; তথাপি পিতৃ-আজ্ঞা লঙ্ঘন করিলেন না।

ঔদ্ধত্য। বাল্যকালে তিনি অত্যন্ত উদ্ধত ছিলেন, সর্ব্বদাই দুরন্তপনা করিতেন; বিদ্যারসে মগ্ন হইয়া মধ্যে একটু শান্ত হইয়াছিলেন; এখন আবার পূর্ব্ব স্বভাব জাগিয়া উঠিল। অল্প বয়স, লেখা পড়ার কাজ নাই; দুরন্তপনা না করিয়া করিবেনই বা কি? রাত্রিতে সমবয়স্কদের সঙ্গে মিলিত হইয়া কখনও প্রতিবেশীদের কলাগাছ ভাঙ্গিতেন, কখনও বা বাহির হইতে তাঁহাদের ঘরের দ্বার বন্ধ করিয়া দিতেন; কোনও সময়ে বা আস্তাকুড়ে যাইয়া বর্জ্য হাড়ির উপরে বসিয়া থাকিতেন এবং সমস্ত গায়ে হাড়ির কালি মাখিতেন। মাতা শাসন করিলে বলিতেন—"…তোরা মোরে না দিস পড়িতে। ভদ্রাভদ্র মূর্খ বিপ্রে জানিবে কেমতে॥"

উপনয়ন ও পুনঃ অধ্যয়নারম্ভ। নিমাইকে বিদ্যালয়ে পাঠাইবার নিমিত্ত সকলেই মিশ্রকে পরামর্শ দিতে লাগিলেন। উপনয়ন-সংস্কারের পরে তিনি নিমাইকে গঙ্গাদাস-পণ্ডিতের টোলে আবার ভর্ত্তি করাইয়া দিলেন। নিমাই আবার খুব উৎসাহের সহিত অধ্যয়ন করিতে লাগিলেন।

পিতৃবিয়োগ। কিছুকাল পরে জগন্নাথমিশ্র দেহত্যাগ করিলেন। মাতা-পুত্র দুইজনেই শোকে ম্রিয়মাণ হইলেন। মাতা প্রাণ দিয়া পিতৃহীন নিমাইয়ের লালন পালন করিতে লাগিলেন। পূর্ব্বে দুরন্তপনা দেখিলে জগন্নাথ মিশ্র শাসন করিতেন; এখন শাসন করিবার আর কেহ নাই; তাই মায়ের অত্যধিক আদরে নিমাই আবার বিষম উদ্ধত হইয়া উঠিলেন। চাহিবামাত্রই কোনও জিনিস না পাইলে আর রক্ষা ছিল না; ঘরের জিনিস পত্র ভাঙ্গিয়া চুরিয়া লণ্ড ভণ্ড করিতেন। যাহা হউক, অধ্যয়নে তাঁহার শৈথিল্য ছিল না; অল্প সময়ের মধ্যেই তিনি একজন খ্যাতনামা পণ্ডিত হইয়া পড়িলেন।

প্রথম বিবাহ। অধ্যয়ন শেষ হওয়ার পূর্ব্বেই বল্লভাচার্য্যের কন্যা শ্রীমতী লক্ষ্মীদেবীর সহিত নিমাই-পণ্ডিতের বিবাহ হইল।

অধ্যাপন। অধ্যয়ন শেষ করিয়া নিমাই-পণ্ডিত অধ্যাপন আরম্ভ করিলেন; নানাদিগ্‌দেশ হইতে শত শত ছাত্র আসিয়া তাঁহার টোলে ভর্ত্তি হইতে লাগিলেন। নিমাই-পণ্ডিতের পাণ্ডিত্যের গৌরবে নবদ্বীপ ধন্য হইয়া গেল। নবদ্বীপ তখন বিদ্যাচর্চ্চার একটী প্রধান কেন্দ্র ছিল; সেস্থানে অনেক খ্যাতনামা পণ্ডিতের বাস ছিল। নবদ্বীপের পণ্ডিতদিগকে বিদ্যাযুদ্ধে পরাজিত করিবার অভিপ্রায়ে অন্য স্থান হইতেও অনেক খ্যাতনামা দিগ্‌বিজয়ী পণ্ডিত নবদ্বীপে আসিতেন। নিমাই-পণ্ডিতের নিকটে তাঁহাদের সকলকেই পরাজয় স্বীকার করিতে হইত।

পূর্ব্ববঙ্গ ভ্রমণ ও তপনমিশ্র। তৎকালের পণ্ডিতগণের মধ্যে কেহ কেহ বিদ্যা-বিতরণের উদ্দেশ্যে দেশ ভ্রমণও করিতেন। আমাদের নিমাই-পণ্ডিতও একবার পূর্ব্ববঙ্গে আসিয়াছিলেন। তখন অনেক বিদ্যার্থী তাঁহার কৃপা লাভ করিয়াছিলেন। অনেককে অনেক স্থানে পড়াইয়াছিলেন। নামসঙ্কীর্ত্তনের প্রচারও তিনি পূর্ব্ববঙ্গেই আরম্ভ করেন। "এই মত বঙ্গের লোকের কৈলা মহা হিত। নাম দিয়া ভক্ত কৈল, পড়াঞা পণ্ডিত ॥ ১।১৬।১৭ ॥" পদ্মাতীরে তপন-মিশ্র নামক এক বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ সাধ্য-সাধন-তত্ত্ব নির্ণয় করিতে না পারিয়া বড় দুঃখিত হইয়াছিলেন। স্বপ্নযোগে এক ব্রাহ্মণের আদেশ পাইয়া তিনি নিমাই-পণ্ডিতের শরণাপন্ন হইলেন। নিমাই-পণ্ডিত তাঁহাকে সাধ্য-সাধন-তত্ত্ব বুঝাইয়া দিলেন এবং বারাণসীতে যাইয়া তারক-ব্রহ্ম হরিনাম জপ করিতে উপদেশ দিলেন।

নাম-বিতরণের আরম্ভ। শ্রীহরিনাম-সঙ্কীর্ত্তনের মধ্যেই প্রভুর জন্ম। সকল শিশুই শিশুকালে কান্নাকাটি করে, প্রভুও করিতেন; কিন্তু অন্য শিশুর কান্নাকাটি যে ভাবে থামিত, তাঁহার কান্না সেভাবে থামিত না। তাঁহার নিকটে "হরি হরি" বলিলেই তাঁহার কান্না থামিত, অন্য কিছুতেই না। তাই রমণীগণ কৌতুকবশতঃ তাঁহার নাম রাখিয়াছিলেন—গৌরহরি। নাম-সঙ্কীর্তন প্রচারের নিমিত্তই তাঁহার আবির্ভাব। কিন্তু পূর্ব্ববঙ্গে আগমনের পূর্ব্বে নবদ্বীপে তিনি কেবল বিদ্যারসেই মত্ত ছিলেন, নাম-প্রচারমূলক কোনও কথাই কোনও দিন বলেন নাই। পূর্ব্ববঙ্গ-ভ্রমণকালে "যাহাঁ যায় তাহাঁ লওয়ায় নাম-সঙ্কীর্ত্তন ॥ ১।১৬।৬ ॥" তাঁহার প্রকটলীলার প্রধান-কার্য্য নাম-সঙ্কীর্ত্তনের প্রচার বোধ হয় পূর্ব্ববঙ্গেই আরব্ধ হইয়াছিল।

লক্ষ্মীদেবীর অন্তর্ধান ও বিষ্ণুপ্রিয়ার বিবাহ। যাহা হউক, যখন তিনি পূর্ব্ববঙ্গে, তখন সর্পদংশনের ব্যপদেশে তাঁহার সহধর্ম্মিণী লক্ষ্মীদেবী অন্তর্দ্ধান প্রাপ্ত হইলেন। পণ্ডিত গৃহে ফিরিয়া গিয়া মাতাকে সান্ত্বনা দিলেন এবং কিছুকাল পরে রাজপণ্ডিত শ্রীসনাতনের কন্যা শ্রীমতী বিষ্ণুপ্রিয়া দেবীর পাণিগ্রহণ করিলেন।

বৈষ্ণবদের উপদেশ। নবদ্বীপে তখনও কয়েকজন ভজন-পরায়ণ বৈষ্ণব ছিলেন। নিমাই-পণ্ডিতের অসাধারণ পাণ্ডিত্য ও প্রতিভা এবং অলোক-সামান্য সৌন্দর্য্য সকলের চিত্তকেই আকৃষ্ট করিয়াছিল। শ্রীবাস-পণ্ডিত ও মুরারিগুপ্ত প্রমুখ মহাভাগবত বৈষ্ণবগণও তাঁহাকে অত্যন্ত প্রীতি করিতেন; কিন্তু তিনি কৃষ্ণ-ভজন করেন না—ইহাই তাঁহাদের বিশেষ দুঃখের হেতু ছিল। মাঝে মাঝে তাঁহারা কৃষ্ণ-ভজনের নিমিত্ত পণ্ডিতকে উপদেশও দিতেন। কিন্তু তাহাতে বিশেষ ফল হইত বলিয়া তাঁহারা মনে করিতেন না।

গয়াযাত্রা ও দীক্ষা। পিতৃ-শ্রাদ্ধের উদ্দেশ্যে নিমাই-পণ্ডিত গয়ায় গেলেন। সেই স্থানেই তিনি শ্রীপাদ ঈশ্বরপুরীর নিকটে শ্রীকৃষ্ণমন্ত্রে দীক্ষা গ্রহণ করেন। দীক্ষার সঙ্গে সঙ্গেই তাঁহার অন্যভাব প্রকটিত হইল, কৃষ্ণপ্রেমে

তিনি যেন উন্মত্তের ন্যায় হইলেন ; শ্রীবৃন্দাবনে যাইয়া শ্রীকৃষ্ণ-ভজন করিবারই সঙ্কল্প করিলেন—দেশে আর ফিরিবেন না। শ্রীবৃন্দাবনের দিকে রওয়ানাও হইয়াছিলেন, এক দৈববাণী শুনিয়া নিরস্ত হইলেন। তিনি দেশে ফিরিয়া আসিলেন। কিন্তু যে নিমাই-পণ্ডিত গয়ায় গিয়াছিলেন, সেই নিমাই-পণ্ডিত যেন আর আসিলেন না ; যিনি আসিলেন, তিনি যেন অন্য একজন। সকলে দেখিয়া বিস্মিত হইল—পাণ্ডিত্য-গৌরবে উদ্ধত সেই নিমাই-পণ্ডিত আর নাই ; তংস্থলে কৃষ্ণবিরহ-কাতর, কৃষ্ণের সহিত মিলনের নিমিত্ত উৎকণ্ঠিত, দৈন্যের প্রকট-বিগ্রহ-সদৃশ এক পরমভাগবত যেন আসিয়া উপস্থিত। দেখিয়া নবদ্বীপস্থ বৈষ্ণব-মণ্ডলীর আনন্দের আর সীমা-পরিসীমা রহিল না। তাঁহারা যেন আকাশের চাঁদ হাতে পাইলেন, ভক্তিপূর্ণ হৃদয়ে শ্রীকৃষ্ণচরণে নিজেদের কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করিতে লাগিলেন।

পরিবর্ত্তন। প্রভু এখন আর বিদ্যারসাস্বাদনের নিমিত্ত পণ্ডিতের সভায় যান না, অধ্যাপনের নিমিত্ত চতুষ্পাঠীতে যান না—গেলেও পুঁথি খুলিয়া কেবল "কৃষ্ণ কৃষ্ণ"ই বলেন, আর ব্যাকরণের সূত্র-পাঁজি ব্যাখ্যার ছলেও কৃষ্ণ-কথাই বলেন। তাঁহার ইষ্টগোষ্ঠি এখন কেবল বৈষ্ণবদের সঙ্গে—তাঁদের সঙ্গে কৃষ্ণকথা, তাঁদের সঙ্গে কৃষ্ণগুণ-স্মরণে ক্রন্দন, কখনও বা কৃষ্ণ-বিরহে ভূলুণ্ঠন।

অধ্যাপনা শেষ ও কীর্ত্তনারম্ভ। অধ্যাপনা শেষ হইল। ছাত্রগণ পুঁথিতে ডোর দিলেন। তাঁহারাও তাঁহাদের অধ্যাপকের সঙ্গে কৃষ্ণকীর্ত্তনে মত্ত হইলেন। সর্ব্বত্র কীর্ত্তন হইতে লাগিল—বিশেষরূপে শ্রীবাসের অঙ্গনে।

কীর্ত্তনে বিঘ্ন। কীর্ত্তনাদি ভালবাসেন না, এমন লোকই তখন নবদ্বীপে বেশী ছিলেন। পণ্ডিতের সঙ্গগুণে এবং কীর্ত্তন-প্রভাবে অনেকেরই মতি-গতি পরিবর্ত্তিত হইল। কিন্তু তথাপি অনেকে তখনও বিরোধী হইয়া দাঁড়াইলেন। সঙ্কীর্ত্তনের ধ্বনি যেন তাঁহাদের কর্ণপটহে উত্তপ্ত লৌহশলাকাবৎ বিদ্ধ হইতে লাগিল। তাঁহারা গিয়া মুসলমান-কাজির নিকটে নালিশ করিলেন। কাজি আদেশ দিলেন—কেহ কীর্ত্তন করিতে পারিবে না ; কোনও কোনও স্থলে খোল-করতালাদিও কাজি নষ্ট করিয়া দিলেন। সঙ্কীর্ত্তনরস-লোলুপ বৈষ্ণবগণ প্রমাদ গণিলেন ; ভীত হইয়া সকলে নিমাই-পণ্ডিতের শরণাপন্ন হইলেন ; তিনি তাঁহাদিগকে অভয় দিলেন।

মহাসঙ্কীর্ত্তন ও কাজি দমন। শ্রীনিত্যানন্দ, শ্রীহরিদাস ঠাকুর, শ্রীমদদ্বৈতাচার্য্য, শ্রীগদাধর আদি আসিয়া পূর্ব্বেই মিলিত হইয়াছিলেন। সকলকে লইয়া পণ্ডিত এক মহাসঙ্কীর্ত্তনের আয়োজন করিলেন। শ্রীগৌরাঙ্গের আদেশে সমস্ত নগর দীপাবলী, পুষ্পমালা ও আম্রপল্লবে সুসজ্জিত হইল ; প্রতি গৃহদ্বারে রম্ভাতরু ও পূর্ণ কুম্ভ স্থাপিত হইল। সন্ধ্যাসময় মশাল-হস্তে সহস্র সহস্র লোক রাজপথে সমবেত হইল, শতশত খোল, সহস্র সহস্র করতাল, সহস্র সহস্র শঙ্খ-ঘণ্টার নিনাদে, আর সহস্র কণ্ঠের সমুচ্চ হরি হরি ধ্বনিতে নবদ্বীপের আকাশ বাতাস বিদীর্ণ হইতে লাগিল। সঙ্কীর্ত্তন-নাটুয়া শ্রীগৌরাঙ্গের আজ আর আনন্দের সীমা নাই। তিনি ভুবন-মোহন-বেশে সজ্জিত হইলেন ; সে সজ্জার বর্ণনা দেওয়ার শক্তি আমাদের নাই ; শ্রীলবৃন্দাবনদাস-ঠাকুর যে বর্ণনা দিয়াছেন, তাহাই এস্থলে উদ্ধৃত করিয়া দিতেছি :—

"জিনিয়া কন্দর্প-কোটি লাবণ্যের সীমা। জ্যোতির্ম্ময় কনক-বিগ্রহ দেবসার। চন্দন-ভূষিত যেন চন্দ্রের আকার॥ চাঁচর চিকুর শোভে মালতির মালা। মধুর মধুর হাসে জিনি সর্ব্বকলা॥ ললাটে চন্দন শোভে ফাগুবিন্দু সনে। বাহু তুলি হরি বলে শ্রীচন্দ্রবদনে॥ আজানুলম্বিত মালা সর্ব্ব অঙ্গে দোলে। সর্ব্ব অঙ্গ তিতে পদ্ম-নয়নের জলে॥ দুই মহাভুজ যেন কনকের স্তম্ভ। পুলকে শোভয়ে যেন কনক-কদম্ব॥ সুন্দর অধর অতি সুন্দর দর্শন। শ্রুতিমূলে শোভা করে ভ্রূযুগ পত্তন॥ গজেন্দ্র জিনিয়া স্কন্ধ হৃদয় সুপীন। তহি শোভে শুক্ল যজ্ঞ-সূত্র অতিক্ষীণ। চরণারবিন্দে রমা তুলসীর স্থান। পরম নির্ম্মল সূক্ষ্ম বাস পরিধান॥" প্রভু সঙ্কীর্ত্তনে বাহির হইলেন। তিন সম্প্রদায় গঠন করিলেন :—"আগে সম্প্রদায়ে নৃত্য করে হরিদাস। মধ্যে নাচে আচার্য্য গোসাঞি পরম উল্লাস॥ পাছে সম্প্রদায়ে নৃত্য করে গৌরচন্দ্র। তাঁর সঙ্গে নাচি বুলে প্রভু নিত্যানন্দ॥" কীর্ত্তন করিতে করিতে সমস্ত নগর

ভ্রমণ করিলেন; শেষে কাজির বাড়ীতে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। সঙ্কীর্ত্তনের মহা রোল শুনিয়া কাজি পূর্ব্ব হইতেই অন্তঃপুরে আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিলেন। নিমাই-পণ্ডিতের আহ্বানে সন্ত্রস্ত-হৃদয়ে তিনি বাহিরে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। উভয়ের কথাবার্ত্তা হইল; যবন-কাজি প্রভুর আনুগত্য স্বীকার করিলেন, আর যাহাতে কীর্ত্তনে বিঘ্ন না জন্মে, তাহার বন্দোবস্ত করিবেন বলিয়া অঙ্গীকার করিলেন।

এখন হইতে নির্ব্বিঘ্নে সঙ্কীর্ত্তন চলিতে লাগিল; বৈষ্ণব-বৃন্দের আর আনন্দের সীমা রহিল না।

জগাই-মাধাই উদ্ধার। নবদ্বীপের সহর-কোটাল জগাই-মাধাইর জন্ম ব্রাহ্মণ-কুলে; কিন্তু তাঁহারা মদ্যপ, দুর্দ্দান্ত এবং দুশ্চরিত্র ছিলেন; এমন গর্হিত কর্ম্ম বোধ হয় কিছু ছিল না, যাহা তাঁহাদের অসাধ্য ছিল। তাঁহাদের দৌরাত্ম্যে পথে সাধুসজ্জনের যাতায়াত বিপদসঙ্কুল ছিল। প্রভুর আদেশে শ্রীমন্নিত্যানন্দ এবং শ্রীহরিদাস যখন নগরে নাম প্রচার করিতেছিলেন, তখন একদিন জগাই-মাধাই তাঁহাদিগের পশ্চাতেও ধাবিত হইয়াছিলেন। দ্বিতীয় দিন মদ্যপ মাধাই একটা সটুকী তুলিয়া নিত্যানন্দের মাথায় আঘাত করিলেন; মাথা কাটিয়া দর দর রক্ত পড়িতে লাগিল; মাধাই আবার মারিতে উদ্যত হইলে জগাই বাধা দিলেন এবং মাধাইকে তিরস্কার করিতে লাগিলেন। সংবাদ পাইয়া ক্রুদ্ধ হইয়া মহাপ্রভু ছুটিয়া আসিলেন; কিন্তু অক্রোধ-পরমানন্দ পরমদয়াল নিত্যানন্দের প্রেমের বন্যায় প্রভুর ক্রোধ ভাসিয়া গেল; দুই ভাইকে কৃপা করিয়া অঙ্গীকার করিলেন। তদবধি জগাই-মাধাই পরম-ভাগবত হইয়া পড়িলেন।

সন্ন্যাস গ্রহণ। চব্বিশ বৎসর বয়সে শ্রীমন্ মহাপ্রভু বৃদ্ধা জননী, কিশোরী ভার্য্যা এবং তদ্গত-প্রাণ ভক্ত-বৃন্দকে কাঁদাইয়া কাটোয়া নগরে শ্রীপাদ কেশব ভারতীর নিকটে সন্ন্যাস গ্রহণ করিলেন। শ্রীমন্নিত্যানন্দ কৌশলে তাঁহাকে শান্তিপুরে শ্রীঅদ্বৈতের ভবনে লইয়া আসিলেন। সেস্থানে নদীয়াবাসী সমস্ত লোক আসিয়া উপস্থিত হইলেন। শোকবিহ্বলা শচীমাতাও আসিলেন। কিন্তু পরম-দুঃখিনী বিষ্ণুপ্রিয়ার আসিবার আদেশ ছিলনা। হা প্রিয়াজি! হা করুণাময়ি! জগদ্বাসীর উদ্ধারের নিমিত্ত তুমি কত দুঃখ, কত কষ্ট না সহ্য করিয়াছ—তোমার হৃদয়ের ধন কোটি-মন্মথ-মদন—শ্রীশ্রীগৌর-সুন্দরকে মায়াহত দীনদুঃখীর দ্বারে দ্বারে হরিনাম বিলাইবার নিমিত্ত—আপনি কাঁদিয়া জগতের জীবকে কাঁদাইবার নিমিত্ত—ত্রিতাপদগ্ধ আচণ্ডাল সাধারণকে স্বীয় কোটি-চন্দ্র-সুশীতল শ্রীচরণতলে আশ্রয় দিবার নিমিত্ত—তুমি জগতের দ্বারে ছাড়িয়া দিয়াছ; ভক্তি-স্বরূপিণি জগত্তারিণি! জগৎকে ভক্তি-সম্পত্তি বিলাইবার নিমিত্ত তুমি নিজে চিরদুঃখ বরণ করিয়া লইয়াছ! ধন্য তুমি, ধন্য তোমার কৃপা।

শান্তিপুরে। শচীমাতা শান্তিপুরে গেলেন। মুণ্ডিত-মস্তক প্রাণের নিমাইকে কোলে বসাইয়া তাঁহার চাঁদবদন নিরীক্ষণ করিলেন, শ্রাবণের ধারার ন্যায় তাঁহার দুই নয়নে অশ্রু ঝরিতে লাগিল। দুঃখিনী জননী; একে একে আটটী কন্যা হারাইয়াছেন; সুপণ্ডিত, সুন্দর-দর্শন কিশোর পুত্র বিশ্বরূপও সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়া চিরকালের তরে চলিয়া গেলেন; তার পরে স্বামিহারা হইলেন। বৃদ্ধ-বয়সের একমাত্র সম্বল, অন্ধের নয়নসদৃশ নিমাই তাঁহার একমাত্র ভরসার স্থল ছিল। সেই নিমাইও আজ বিশ্বরূপের ন্যায়ই চলিয়া যাইতেছেন। ঘরে কিশোরী বধূ বিষ্ণুপ্রিয়া; কি বলিয়া তিনি তাঁকে সান্ত্বনা দিবেন? অভাগিনী জন্মের মত একবার দর্শন করিতেও পারিল না। নিমাইর বদন-পানে চাহিয়া চাহিয়া মা এসব ভাবিতেছেন; আর অঝোর নয়নে কাঁদিতেছেন।

নীলাচল যাত্রা। প্রভুর সন্ন্যাসাশ্রমের নাম শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য। তিনি কয়েক দিন শান্তিপুরে থাকিয়া মাতার আদেশ গ্রহণ করিয়া নীলাচলে যাত্রা করিলেন। নীলাচলে তিনি চব্বিশ বৎসর ছিলেন।

ইতস্ততঃ গমনাগমন। এই চব্বিশ বৎসরের প্রথম ছয় বৎসর নানা স্থানে ভ্রমণ করিয়া নাম-প্রেম বিতরণ করিয়াছিলেন। দাক্ষিণাত্যে রামেশ্বর পর্য্যন্ত গিয়াছিলেন। বৃন্দাবনে যাওয়ার উপলক্ষে আর একবার বাঙ্গালায় আসিয়াছিলেন; সেবারও শান্তিপুরে শচীমাতাকে দর্শন দিয়াছিলেন; রামকেলিতে শ্রীরূপ-সনাতনকে কৃপা করিয়া-ছিলেন। কিন্তু সেবার তাঁহার বৃন্দাবন যাওয়া হয় নাই। সঙ্গে লোক-সঙ্ঘট্ট দেখিয়া নীলাচলে ফিরিয়া আসিলেন।

পরে ঝারিখণ্ডের বনপথে কাশী ও প্রয়াগ হইয়া প্রভু শ্রীবৃন্দাবনে গিয়াছিলেন। দক্ষিণ-যাত্রায় প্রভুর সঙ্গে

কৃষ্ণদাস-নামক এক ব্রাহ্মণ গিয়াছিলেন; কবি কর্ণপূর তাঁহার "শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতম্" নামক সংস্কৃত-গ্রন্থেও একথা লিখিয়া গিয়াছেন। শ্রীবৃন্দাবন-যাত্রায় বলভদ্র-ভট্টাচার্য্য ও তাঁহার এক ভৃত্য ব্রাহ্মণ সঙ্গে গিয়াছিলেন। কাশীতে তপন-মিশ্রের গৃহে প্রভু ভিক্ষা করিতেন।

শ্রীরূপের শিক্ষা। প্রভু মথুরায় গেলেন। শ্রীপাদ মাধবেন্দ্র পুরীর শিষ্য এক সনৌড়িয়া ব্রাহ্মণ সঙ্গে থাকিয়া প্রভুকে সমস্ত দর্শনীয় স্থানগুলি দেখাইলেন। আরিট-গ্রামে শ্যামকুণ্ড ও রাধাকুণ্ডের আবিষ্কার করিলেন। প্রত্যাবর্ত্তনের পথে যখন প্রয়াগে আসিলেন, তখন শ্রীপাদ রূপ-গোস্বামী সে স্থানে তাঁহার সহিত মিলিত হইলেন। প্রভু দশ দিন সে স্থানে থাকিয়া শ্রীরূপকে কৃপা করিয়া নানাবিধ তত্ত্ব শিক্ষা দিলেন।

প্রকাশানন্দের উদ্ধার। পুনরায় কাশীতে আসিলেন। প্রকাশানন্দ-সরস্বতী নামক এক অদ্বিতীয় বৈদান্তিক মায়াবাদী সন্ন্যাসী তখন কাশীতে ছিলেন; তাঁহার পাণ্ডিত্য-প্রতিভা ভারত-বিখ্যাত ছিল। প্রভু হরিনাম করিয়া নৃত্য-কীর্ত্তন করিতেন বলিয়া তিনি তাঁহার নিন্দা করিতেন। প্রভু এবার কৃপা করিয়া প্রকাশানন্দকে উদ্ধার করিলেন; সশিষ্য প্রকাশানন্দ বৈষ্ণব-ধর্ম্ম গ্রহণ করিলেন; কাশীনগরী সঙ্কীর্ত্তন-রোলে মুখরিত হইয়া উঠিল।

সনাতন-শিক্ষা। কাশীতে শ্রীপাদ সনাতন আসিয়া প্রভুর সঙ্গে মিলিত হইলেন। দুই মাস থাকিয়া প্রভু তাঁহাকে সমস্ত তত্ত্ব শিক্ষা দিলেন।

কাশী হইতে প্রভু পুনরায় নীলাচলে ফিরিয়া আসিলেন। প্রভুকে পাইয়া নীলাচলবাসী ভক্তগণের প্রাণহীন দেহে যেন প্রাণ ফিরিয়া আসিল।

এইরূপে নানা স্থানে যাতায়াতে প্রভুর সন্ন্যাসের প্রথম ছয় বৎসর অতিবাহিত হইল। বৃন্দাবন হইতে নীলাচলে ফিরিয়া আসার পরে প্রভু আর দূর দেশে কোথাও যায়েন নাই, মাঝে মাঝে কেবল অল্প সময়ের জন্য আলালনাথ যাইতেন।

নীলাচলে বিরহ-লীলা। শেষ আঠার বৎসর প্রভু নীলাচলেই স্বরূপ-দামোদর, রায়-রামানন্দাদি অন্তরঙ্গ ভক্তবৃন্দের সঙ্গে কৃষ্ণকথা-রসে অতিবাহিত করিয়াছিলেন। এই সময়ে প্রায় সর্ব্বদাই প্রভুর কৃষ্ণ-বিরহ-বিহ্বলতা থাকিত—প্রভুর দেহের উপর দিয়া নানাবিধ ভাবের প্রবল বন্যা যেন বহিয়া যাইত; তাহার ফলে কখনও বা তাঁহার হস্ত-পদাদি দেহমধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া যাইত, তাঁহার দেহ তখন কূর্ম্মাকৃতি ধারণ করিত; আবার কখনও বা হস্তপদের অস্থিগ্রন্থি-আদির প্রত্যেকটী প্রায় বিতস্তি-পরিমাণ শিথিল হইয়া যাইত, দেহ অতি দীর্ঘাকার হইয়া যাইত। কখনও তিনি শ্রীরাধার ভাবে বিরহিণী রমণীর ন্যায় শ্রীকৃষ্ণের জন্য রোদন করিতেন, আবার কখনও বা শ্রীকৃষ্ণস্ফূর্ত্তিতে আনন্দে মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িতেন। কখনও বিরহ-আর্ত্তিতে গৃহ-ভিত্তিতে মুখ-সঙ্ঘর্ষণ করিতেন, আবার কখনও বা যমুনাভ্রমে সমুদ্রে ঝম্প প্রদান করিতেন।

গৌড়ীয় ভক্তগণ প্রতি বৎসর রথযাত্রা-উপলক্ষে নীলাচলে যাইয়া প্রভুর চরণ দর্শন করিতেন; কোনও কোনও বার ভক্ত-গৃহিণীরাও যাইতেন; তাঁহারা দূর হইতে প্রভুকে দর্শন করিতেন—নিকটে যাইতেন না; কারণ, প্রভু সন্ন্যাস গ্রহণ-অবধি স্ত্রীলোক দর্শন করিতেন না। গৌড়ের ভক্তগণ চাতুর্ম্মাস্যের চারিমাস নীলাচলে থাকিতেন; কেহ ঘরে রান্না করিয়া, কেহবা জগন্নাথের মহাপ্রসাদ আনিয়া প্রভুকে ভিক্ষা করাইতেন। তাঁহাদের সঙ্গেই প্রভু একটু আন্মনা থাকিতেন; চাতুর্ম্মাস্য-অন্তে তাঁহারা চলিয়া গেলে প্রভু আবার কৃষ্ণ-বিরহ সমুদ্রে নিপতিত হইতেন।

প্রতাপরুদ্র ও রায়-রামানন্দ। পুরীর রাজা প্রতাপরুদ্র মহাপ্রভুতে আত্ম-সমর্পণ করিয়া কৃতার্থ হইয়াছিলেন। রায়-রামানন্দ ছিলেন বিদ্যা নগরে রাজা প্রতাপরুদ্রের রাজ-প্রতিনিধি। তিনি পরম-পণ্ডিত এবং পরম-বৈষ্ণব ছিলেন। দাক্ষিণাত্য-ভ্রমণকালে গোদাবরী-তীরে প্রভু তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করেন এবং তাঁহার মুখে সাধ্য-সাধন-তত্ত্ব, কৃষ্ণ-তত্ত্ব, রাধাতত্ত্ব, প্রেমতত্ত্ব, রস-তত্ত্বাদি প্রকাশিত করেন। প্রভুর গুণ-মুগ্ধ হইয়া রায়-রামানন্দ রাজা প্রতাপ-রুদ্রের অনুমতি লইয়া প্রভুর চরণ-সন্নিধানে নীলাচলেই বাস করিতে লাগিলেন। তাঁহার আরও চারি ভাই এবং তাঁহার পিতা ভবানন্দ রায়ও প্রভুর অনুগত ভক্ত ছিলেন।

সার্ব্বভৌম। কাশীতে প্রকাশানন্দ-সরস্বতীর ন্যায় বাসুদেব-সার্ব্বভৌম ছিলেন নীলাচলে খুব খ্যাতনামা বৈদান্তিক পণ্ডিত ; অনেক সন্ন্যাসীকে তিনি বেদান্ত পড়াইতেন। প্রভু যখন প্রথমে নীলাচলে উপস্থিত হয়েন, তখন তিনি তাঁহাকেও সাতদিন বেদান্ত শুনাইয়াছিলেন ; পরে প্রভুর মুখে বেদান্তের ব্যাখ্যা এবং শঙ্কর-ভাষ্যের ত্রুটী শুনিয়া বিস্মিত হইলেন ; প্রভু কৃপা করিয়া তাঁহাকে অঙ্গীকার করিলেন ; সার্ব্বভৌম প্রভুর অনুগত ভক্ত হইয়া পড়িলেন।

নীলাচলে প্রভুর আরও অনেক পার্ষদ ছিলেন। প্রভুর সেবা করিয়া তাঁহারা কৃতার্থ হইয়াছেন।

লীলাবসান। ১৪৫৫ শকে ৪৮ বৎসর বয়সে প্রভু লীলা সম্বরণ করেন। তাঁহার লীলা-সম্বরণ এক রহস্যময় ব্যাপার। কেহ বলেন—তিনি শ্রীগোপীনাথের শ্রীবিগ্রহের সহিত মিশিয়া গিয়াছেন ; আবার কেহ বলেন, তিনি শ্রীজগন্নাথ-দেবের শ্রীবিগ্রহের সহিত মিশিয়া গিয়াছেন। যে ভাবেই হউক, প্রভু অন্তর্হিত হইয়াছেন। বহু দিন পরে দুঃস্থ ভারতের বুকে প্রেমভক্তির যে একটা স্নিগ্ধ-জ্যোতিঃপুঞ্জ নামিয়া আসিয়াছিল, তাহা অন্তর্হিত হইয়া গেল। ভক্তবৃন্দ নয়নের মণি হারা হইয়া জীবন্মৃতের ন্যায় নিরানন্দ পৃথিবীর বুকে অতি কষ্টে কিছুকাল নিজেদের গুরু-দেহভার বহন করিয়া অবশেষে তাঁহাদের প্রাণার্ব্বুদ-প্রিয়তমের সান্নিধ্যে চলিয়া গেলেন।

প্রভুর আবির্ভাবের পূর্ব্বে দেশের অবস্থা। শ্রীমন্মহাপ্রভু যখন নবদ্বীপে অবতীর্ণ হয়েন, তখন বাঙ্গালায় ধর্ম্মভাবের অবস্থা খুব শোচনীয় ছিল। পণ্ডিতেরা কেবল বিদ্যাচর্চ্চা নিয়াই ব্যস্ত থাকিতেন ; বিদ্যাশিক্ষার মুখ্য উদ্দেশ্য যে ভগবদ্-ভজন, তাহা যেন তাঁহারা ভুলিয়াই গিয়াছিলেন। যাঁহারা বিষয়ী, তাঁহারা অষ্টপ্রহর বিষয়-কর্ম্মেই লিপ্ত থাকিতেন—বিষয়ের উন্নতি-সাধনকেই তাঁহারা পরম-পুরুষার্থ বলিয়া মনে করিতেন। "কেহো পাপে কেহ পুণ্যে করে বিষয়-ভোগ। ভক্তিগন্ধ নাহি যাতে যায় ভব-রোগ॥"

অদ্বৈতের সঙ্কল্প। যাঁহারা কিছু ধর্ম্ম-কর্ম্ম করিতে ইচ্ছুক হইতেন, মঙ্গলচণ্ডীর গীত এবং বিষহরির পূজাই ছিল তাঁহাদের প্রধান অনুষ্ঠেয়। এইরূপই ছিল দেশের সাধারণ অবস্থা। যাঁহারা ঐকান্তিক-চিত্তে শ্রীকৃষ্ণ-ভজন করিতেন, তাঁহাদের সংখ্যা ছিল অতি অল্প। সাধারণ লোক তাঁহাদের আদর্শের অনুসরণ তো করিতই না, বরং তাঁহাদিগকে উপহাস করিত। দেশের এইরূপ দুরবস্থা দেখিয়া তাঁহাদের প্রাণ কাঁদিয়া উঠিল। শ্রীঅদ্বৈত-আচার্য্য মনে করিলেন —জগতের যেরূপ-অবস্থা, তাহাতে স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ ব্যতীত আর কেহই কিছু করিতে পারিবেন না। "আপনি শ্রীকৃষ্ণ যদি করেন অবতার। আপনি আচরি ভক্তি করেন প্রচার॥"—তাহা হইলেই জীবের উদ্ধার হইতে পারে। তাই তিনি সঙ্কল্প করিলেনঃ—"শুদ্ধ ভাবে করিব কৃষ্ণের আরাধন। নিরন্তর সদৈন্যে করিব নিবেদন॥ আনিয়া কৃষ্ণেরে করোঁ কীর্ত্তন সঞ্চার। তবে সে "অদ্বৈত" নাম সফল আমার॥"

তিনি তাঁহার সঙ্কল্পানুরূপ কার্য্য করিতে লাগিলেন ; ঠাকুর-হরিদাসও নামকীর্ত্তনাদি দ্বারা তাঁহার আনুকূল্য করিতে লাগিলেন। কিছুদিন পরে শ্রীমন্মহাপ্রভু অবতীর্ণ হইলেন ; কয়েক বৎসর পরে মহাপ্রভুর প্রভাব দেখিয়া তাঁহারা মনে করিলেন, তাঁহাদের আরাধনা ফলবতী হইয়াছে, মরুভূমিতে সুর-তরঙ্গিণী প্রবাহিত হইবার সুযোগ উপস্থিত হইয়াছে ; আর জীবের ভয় নাই।

আবির্ভাবের ফল। বাস্তবিকই শ্রীগৌরাঙ্গের আবির্ভাবের সঙ্গে সঙ্গে একটা নূতন যুগ প্রবর্ত্তিত হইল। অপ্রাকৃত গোলোকধাম হইতে যেন একটা স্নিগ্ধ মধুর ভাবধারা বাঙ্গালার মরুতুল্য শুষ্ক প্রাঙ্গণে আবির্ভূত হইল, শুষ্কতরু মঞ্জুরিত হইল, মৃণ্ময়ী প্রতিমা চিন্ময়ী আনন্দঘন-মূর্ত্তিতে—স্নিগ্ধহাস্যবিমণ্ডিত-মৃদুমধুর-কলভাষণে—চতুর্দ্দিকে যেন আনন্দের বন্যা প্রবাহিত করিল।

উপাস্যের আকর্ষকত্ব। শ্রীমন্মহাপ্রভু বাঙ্গালার ধর্ম্মরাজ্যে এক অভুতপূর্ব্ব পরিবর্ত্তন আনয়ন করিলেন। ভগবানের যে রূপটী তিনি জীবের সাক্ষাতে উপস্থিত করিলেন, পূর্ব্ববর্ত্তী কোনও আচার্য্যই তাহার সংবাদ বিশেষভাবে দেন নাই। এই রূপে ঐশ্বর্য্যের বিভীষিকা নাই, আছে মাধুর্য্যের প্রীতিপূর্ণ আকর্ষণ ; তাঁহার হাতে পাপীর হৃৎকম্পোৎপাদনকারী তীক্ষ্ণকণ্টকময় জলন্ত লৌহদণ্ড নাই—আছে সর্ব্বচিত্তাকর্ষক মোহনবংশী ; শতযোজন দূর হইতে সম্ভ্রস্ত হৃদয়ে তাঁহার উদ্দেশ্যে প্রকম্পিত-করযুগলকে বক্ষোপরি ধারণ করিয়া দণ্ডায়মান থাকিতে ইচ্ছা হয় না—ইচ্ছা হয়,

দৌড়াইয়া গিয়া কোটি-মন্মথ-মনোমথন স্নিগ্ধহাস্যোজ্জ্বল সেই সর্ব্বাত্মবিস্মাপন অসমোর্দ্ধ-মাধুর্য্যময় রূপটীকে হৃদয়ে জড়াইয়া ধরিতে। এই রূপটী যে মহাপ্রভুর একটী নূতন পরিকল্পনা, তাহা নয়। শ্রুতি পরতত্ত্ববস্তুর যে পরিচয় দিয়াছেন, প্রভু তাহারই সমুজ্জ্বল চিত্রটী জগতের সাক্ষাতে প্রকটিত করিয়াছেন। শ্রুতি বলেন—পরতত্ত্ববস্তু আনন্দস্বরূপ, রসস্বরূপ। কিন্তু তাঁহার এই আনন্দ-স্বরূপত্বের, রস-স্বরূপত্বের তাৎপর্য্য কি, তাহা এমন জাজ্জ্বল্যমান ভাবে ইতঃপূর্ব্বে কেহ জানান নাই। ভগবত্তার সার কি, তাহাও এমন সুন্দর ভাবে কেহ জানান নাই। বরং সাধারণ লোকের ধারণা ছিল যে, ঐশ্বর্য্যই বুঝি ভগবত্তার সার; তাই লোক ভগবানের নামেই যেন ভীত, সন্ত্রস্ত, চমকিত হইয়া উঠিত। কিন্তু প্রভুই সর্ব্বপ্রথমে জলদ-গম্ভীরস্বরে ঘোষণা করিলেন—"মাধুর্য্য ভগবত্তা-সার।" ইহাই শ্রুতির আনন্দ-স্বরূপত্বের, রস-স্বরূপত্বের চরম তাৎপর্য্য। তিনি আরও জানাইলেন—পরতত্ত্বে এই মাধুর্য্যের বিকাশ এতই সর্ব্বাতিশায়ী যে, তাহা "কোটি ব্রহ্মাণ্ড পরব্যোম, তাহাঁ যে স্বরূপগণ, বলে হরে তা-সভার মন। পতিব্রতা-শিরোমণি, যারে কহে বেদবাণী, আকর্ষয়ে সেই লক্ষ্মীগণ॥" এই আনন্দঘনবিগ্রহ, রসঘনবিগ্রহ, মাধুর্য্যঘনবিগ্রহ, অখিল-রসামৃতবারিধি পরতত্ত্ববস্তু হইতেছেন—"পুরুষ যোষিৎ কিবা স্থাবর জঙ্গম। সর্ব্বচিত্তাকর্ষক সাক্ষাৎ মন্মথ-মদন॥ ২.৮.১১০।", তিনি "আত্মপর্য্যন্ত সর্ব্বচিত্তহর।"

সাধনের আনন্দ-দায়কত্ব। আর তিনি যে সাধন-পন্থা দেখাইয়া গেলেন, তাহাও অপূর্ব্ব। তাহাতে জাতি-কুলের বিচার নাই, ধনি-দরিদ্রের বিচার নাই, পণ্ডিত-মূর্খের বিচার নাই, দেশ-কালের বিচার নাই—যে কেহ, যে কোনও সময়ে, যে কোনও স্থানে, যে কোনও অবস্থায় শ্রীকৃষ্ণভজন করিতে পারেন। শ্রীগৌরাঙ্গদেব ইহা কেবল মুখে বলিয়াই ক্ষান্ত হন নাই—কার্য্যেও দেখাইয়া গিয়াছেন—কত কোল, ভীল, সাঁওতাল—কত অন্ধ্র, পুলিন্দ, পুক্কস, কত কুক্কুর-ভোজী হীনাচার, এমন কি কত যবনকেও যে কৃপা করিয়া তিনি বৈষ্ণব করিয়াছেন, তাহার ইয়ত্তা নাই। তাঁহার প্রদর্শিত সাধন-পন্থায় কোনওরূপ দুঃখ নাই, কষ্ট নাই—আছে এক অপূর্ব্ব আনন্দ, সাধনেই আনন্দ—সিদ্ধাবস্থার কথা তো দূরে। তিনি দেশের মধ্যে এক প্রেমের বন্যা প্রবাহিত করিয়া দিয়াছিলেন—তাহার প্রবল প্রবাহে সাধনবিষয়ে সমস্ত সামাজিক বা লৌকিক বাধাবিঘ্ন—অনধিকারাদি দূরে অপসারিত হইয়া গিয়াছিল।

সাহিত্যের উপর প্রভাব। শ্রীগৌরাঙ্গের আবির্ভাবে বাঙ্গালা-সাহিত্যেও এক নূতন যুগের উদ্ভব হইল। তাঁহাকে এবং তাঁহার প্রবর্ত্তিত ধর্ম্মকে উপলক্ষ্য করিয়া যে সাহিত্য-ভাণ্ডার গড়িয়া উঠিল, তাহা আজ পর্য্যন্তও বাঙ্গালার এবং বাঙ্গালীর গৌরবের বিষয়। এই সাহিত্য দুই শ্রেণীর—বাঙ্গালা এবং সংস্কৃত। বাঙ্গালা-পদাবলী-সাহিত্যের লালিত্য এবং নিত্য নূতন রসধারা বোধ হয় চিরকালই রসজ্ঞ-ভাবুকের চিত্তকে মুগ্ধ করিয়া রাখিতে সমর্থ হইবে। বাঙ্গালাভাষায় লিখিত সর্ব্বপ্রথম চরিত-কথাই বোধ হয় শ্রীল বৃন্দাবনদাস-ঠাকুরের শ্রীশ্রীচৈতন্যভাগবত। তারপরেই শ্রীলকৃষ্ণদাসকবিরাজ-গোস্বামীর শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত। শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত কেবল চরিতকথা নহে; ইহা একখানা দার্শনিক গ্রন্থও,—তাহা আমরা পূর্ব্বেই উল্লেখ করিয়াছি। বৈষ্ণবাচার্য্য-গোস্বামিগণ সংস্কৃত-ভাষাতেও বহু তত্ত্বগ্রন্থ এবং লীলাগ্রন্থ লিখিয়া গিয়াছেন। শ্রীরূপগোস্বামীর ভক্তিরসামৃতসিন্ধু এবং উজ্জ্বলনীলমণি অতি অপূর্ব্ব গ্রন্থ। এজাতীয় গ্রন্থ বোধ হয় ইতঃপূর্ব্বে আর লিখিত হয় নাই। শ্রুতি বলিয়াছেন—রসস্বরূপ পরতত্ত্ববস্তুকে পাইলেই জীব আনন্দী হইতে পারে, জীবের চিরন্তনী সুখবাসনা চরমা তৃপ্তি লাভ করিতে পারে। কিরূপ সাধনপন্থা অবলম্বন করিলে কি ভাবে সেই রসস্বরূপকে পাওয়া যাইতে পারে, সাধনপথে অগ্রসর হইতে হইতে রসস্বরূপের অনন্ত-রসবৈচিত্র্য কিভাবে সাধকের চিত্তে ক্রমশঃ অভিব্যক্ত হয়, বিজ্ঞানসম্মত পন্থায় শ্রীরূপ-গোস্বামী তাঁহার ভক্তিরসামৃতসিন্ধুতে তাহা বিবৃত করিয়াছেন। তাঁহার উজ্জ্বলনীলমণি হইতেছে ভগবৎ-প্রেমসম্বন্ধীয় গ্রন্থ। প্রেমের বিভিন্ন স্তর, তাহাদের বিকাশের ধারা, তাহাদের প্রভাব-আদি এই গ্রন্থে বিজ্ঞানসম্মত পন্থায় বিবৃত হইয়াছে। শ্রীরূপ তাঁহার লঘুভাগবতামৃতে বিভিন্ন ভগবৎ-স্বরূপের সমন্বয় এবং পরস্পর সম্বন্ধের কথা এক অপূর্ব্ব নিপুণতার সহিত বিবৃত করিয়াছেন। শ্রীপাদসনাতন-গোস্বামীর বৃহদ্ভাগবতামৃত একটী অতি সুন্দর সিদ্ধান্তগ্রন্থ। শ্রীজীব-গোস্বামীর ষট্‌সন্দর্ভ গৌড়ীয়-বৈষ্ণবসম্প্রদায়ের দার্শনিক গ্রন্থ; তত্ত্বসন্দর্ভ, পরমাত্মসন্দর্ভ, ভগবৎ-সন্দর্ভ, শ্রীকৃষ্ণসন্দর্ভ, ভক্তিসন্দর্ভ এবং প্রীতিসন্দর্ভ—এই ছয়টী সন্দর্ভই ষট্‌সন্দর্ভের অন্তর্ভুক্ত। তাঁহার গোপালচম্পূ শ্রীকৃষ্ণের অপ্রকট-লীলাসম্বন্ধীয়

বহু তত্ত্বপূর্ণ একখানা বিরাট গ্রন্থ। এই গ্রন্থ-সম্বন্ধে কবিরাজ-গোস্বামী বলিয়াছেন—শ্রীজীব "গোপালচম্পূ করিল গ্রন্থ মহাশূর।" এই তিন গোস্বামী আরও বহু গ্রন্থ লিখিয়া গিয়াছেন। কাব্য, অলঙ্কার, ব্যাকরণ, নাটক—কোনও বিষয়ের গ্রন্থের অভাবই তাঁহারা রাখিয়া যান নাই। জীবনের একটী মুহূর্ত্তও যেন ভগবৎ-প্রসঙ্গ ব্যতীত ব্যয়িত না হয়, এই উদ্দেশ্যে সংস্কৃত-শিক্ষার্থীদিগকে এই সমস্ত গ্রন্থ অধ্যাপন করাইবার ব্যবস্থাই তাঁহারা করিয়া গিয়াছেন। কাব্যালঙ্কারাদিতে ভগবৎ-প্রসঙ্গ সহজেই অন্তর্ভুক্ত করা যায়। কিন্তু অপূর্ব্ব দক্ষতার সহিত তাঁহারা ব্যাকরণের মধ্যেও তাহা প্রবেশ করাইয়াছেন। শ্রীজীব-গোস্বামীর হরিনামামৃত-ব্যাকরণের সুত্রসমূহও হরিনামাত্মক, উদাহরণগুলিও হরিলীলা-বিষয়ক। কবিরাজ-গোস্বামীর গোবিন্দ-লীলামৃত, শ্রীপাদ-বিশ্বনাথচক্রবর্ত্তীর শ্রীকৃষ্ণ-ভাবনামৃত এবং কবিকর্ণপূরের আনন্দবৃন্দাবনচম্পূ—ভক্তিমার্গের সাধকের ভজন-পুষ্টির অনুকূল অতি চমৎকার লীলা-গ্রন্থ। এই তিনজনও আরও বহু গ্রন্থ লিখিয়া গিয়াছেন। বলদেব-বিদ্যাভূষণের ভাষ্যপীঠক, প্রমেয়রত্নাবলী এবং গোবিন্দ-ভাষ্য—তিনটী দার্শনিক গ্রন্থ। গোবিন্দ-ভাষ্য হইতেছে বেদান্তসূত্রের শ্রীমন্‌মহাপ্রভুর মতানুকূল-ভাষ্য। ইতঃপূর্ব্বে বাঙ্গালীর কৃত কোনও বেদান্ত-ভাষ্য ছিলনা। বলদেববিদ্যাভূষণ এই অভাব দূর করিয়া বাঙ্গালাকে গৌরবের এক অতি উচ্চ আসনে সমাসীন করাইয়াছেন।

ভাবের গাম্ভীর্য্য, রসের পরিপাট্য, আস্বাদনের চমৎকারিত্ব এবং ভজনের পোষকত্ব রক্ষার অনুকূলভাবে যাহাতে বৈষ্ণব-পদাবলী সুনিপুণ ভাবে কীর্ত্তিত হইতে পারে, তজ্জন্য শ্রীলনরোত্তমদাস-ঠাকুরাদি বৈষ্ণব-মহাজনগণ অভিনব সুর-তালাদিরও আবিষ্কার করিয়াছেন।

আমাদের বিশ্বাস, নিরপেক্ষভাবে বিচার করিলে দেখা যাইবে—বাঙ্গালার সাহিত্যে, বাঙ্গালার দর্শনে, বাঙ্গালার ভাবধারায়, বাঙ্গালার কৃষ্টিতে গৌড়ীয়-বৈষ্ণব-সম্প্রদায়ের অবদান অতুলনীয়। বাঙ্গালা[র] কৃষ্টি বলিতে মুখ্যতঃ শ্রীশ্রীগৌরসুন্দরের প্রভাবে পরিপুষ্ট কৃষ্টিকেই বুঝায়—একথা বলিলেও বোধ হয় অত্যুক্তি হইবে না। বাঙ্গালার প্রাণের ঠাকুর শ্রীশ্রীগৌরসুন্দর-প্রবর্ত্তিত প্রেমধর্ম্মের প্রভাব কেবল যে বাঙ্গালার কৃষ্টিকেই এক অপূর্ব্ব রসে পরিসিঞ্চিত করিয়াছে, তাহা নহে; সমগ্র ভারতের কৃষ্টিতেও তাহা সঞ্চারিত হইয়াছে।

সমাজ-সংস্কার। বাহ্য দৃষ্টিতে মনে হয়, সমাজ-সংস্কারের দিক্ দিয়া তিনি কিছু করিয়া যান নাই। প্রকাশ্যে তিনি কিছু করেন নাই সত্য; কিন্তু অনুসন্ধান করিলে দেখা যায়, বর্ত্তমান সময়ের সমাজ-সংস্কারের বীজও তিনিই বপন করিয়া গিয়াছেন। এ সম্বন্ধে তাঁহার প্রকাশ্য আন্দোলনের বিঘ্ন অনেকই ছিল। তখন বাঙ্গালার সমাজবন্ধন খুব দৃঢ় ছিল। মুসলমানের কড়োয়ার জল গায়ে লাগিলেই ব্রাহ্মণের জাতি যাইত; এই দিকে স্মার্ত্ত পণ্ডিতগণ আবার তৎকালীন সমাজবন্ধনকে আরও দৃঢ়তর করিবার জন্য চেষ্টিত হইলেন। সাধন-রাজ্যে শ্রীমন্‌মহাপ্রভু যে নূতন সংস্কারের প্রবর্ত্তন করিয়াছিলেন, নবদ্বীপের পণ্ডিত-সমাজ তাহারই বিশেষ বিরোধী হইয়া উঠিয়াছিলেন। বাঙ্গালাদেশে তখন নবদ্বীপের পণ্ডিত-সমাজেরই বিশেষ প্রতিপত্তি—সমাজের সৃষ্টি-স্থিতি-পালনের কর্ত্তা তখন তাঁহারাই। ধর্ম্ম-সংস্কারে—মুখ্যতঃ তাঁহাদের বিরুদ্ধাচরণের ফলেই মহাপ্রভুকে সন্ন্যাস গ্রহণ করিতে হইয়াছিল। যাহা হউক, হিন্দুগণ ধর্ম্মের উপরে সর্ব্বাপেক্ষা বেশী প্রাধান্য দিয়া থাকিলেও কার্য্যতঃ সামাজিক আচার-পদ্ধতির রক্ষা হইলেই তাঁহারা সাধারণতঃ ধর্ম্মরক্ষা হইল বলিয়া মনে করেন। তাই যখন নবদ্বীপবাসী পণ্ডিতগণ দেখিলেন যে, শ্রীগৌরাঙ্গ প্রচলিত সামাজিক নিয়মের প্রধান প্রধান গুলিতে বিশেষরূপে হস্তক্ষেপ করিতেছেন না, তখন তাঁহাদের মনঃপূত না হইলেও তাঁহার ধর্ম্মবিষয়ক আন্দোলনে মৌখিক দু'চারিটী কথা ব্যতীত কার্য্যতঃ বিশেষ কিছু বিঘ্ন উৎপাদন করেন নাই। তাঁহারও মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল ধর্ম্ম-সংস্কার—তাঁহার পার্ষদবৃন্দেরও তাহাই ছিল একমাত্র অভিপ্রায়; তাই তিনিও ধর্ম্ম-সংস্কারের দিকেই বিশেষ মনোযোগ দিলেন। পণ্ডিত-মণ্ডলীর প্রবল বিরুদ্ধাচরণের আশঙ্কাও যে তাঁহার উপর কোনও ক্রিয়া করে নাই, তাহাও বলা যায় না। তিনি হয়তো মনে করিয়াছিলেন—সমাজ-সংস্কার-বিষয়ে প্রাধান্য দিতে গেলে অভীষ্ট ধর্ম্ম-সংস্কারেই সম্ভবতঃ বিঘ্ন উপস্থিত হইবে। ইহাও হয়তো তিনি মনে করিয়া থাকিবেন—ধর্ম্মই মানবের একমাত্র কাম্যবস্তু; প্রকৃত ধর্ম্মের দিকে যদি লোকের মন ধাবিত হয়, তাহা হইলে—সমাজ-ধর্ম্মাদি অনাত্ম-

ধর্ম্মের সহিত ভজনমূলক আত্মধর্ম্মের যে বিশেষ কোনও অচ্ছেদ্য সম্বন্ধ নাই এবং সমাজের মঙ্গলের নিমিত্ত সমাজধর্ম্মের সময়োপযোগী পরিবর্ত্তনও যে অসঙ্গত নয়—তাহা সকলেই বুঝিতে পারিবে।

ভারতীয় ঋষিগণ এবং তাঁহাদের অনুগত সমাজ-সম্বন্ধীয় বিধিব্যবস্থাদাতারাও মানুষের জীবনে আত্মধর্ম্মকেই সকলের উপরে স্থান দিয়া গিয়াছেন। লোকধর্ম্ম-সমাজধর্ম্মাদিকে তাঁহারা আত্মধর্ম্মের অনুগতরূপেই গ্রহণ করিয়াছেন। তাই, ভ্রূণের গর্ভসঞ্চার হইতে আরম্ভ করিয়া শ্রাদ্ধ পর্য্যন্ত সমস্ত লৌকিক অনুষ্ঠানকেই তাঁহারা আত্মধর্ম্মের উপর প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন—বিষ্ণুকে বাদ দিয়া হিন্দুর কোনও অনুষ্ঠান নাই। দৈনন্দিন ব্যাপারেও অনুরূপ ব্যবস্থা। ইহাই হিন্দুসমাজের এক অপূর্ব্ব বৈশিষ্ট্য ছিল; আজকাল নানাকারণে হিন্দু এই বৈশিষ্ট্যকে হারাইতে বসিয়াছে; তাহার ফল কি হইতেছে বা হইবে, ভগবান্ জানেন। যাহা হউক, পূর্ব্বোক্ত বৈশিষ্ট্যের কথা ভবিয়াই শ্রীমন্মহাপ্রভু বোধ হয় মনে করিয়াছিলেন—সমাজের মধ্যে আত্মধর্ম্মের ভাবটা যদি সমুজ্জ্বলরূপে ফুটাইয়া তোলা যায়, প্রয়োজনীয় সমাজ-সংস্কার আর খুব দুরূহ ব্যাপার হইবে না, তাহা আপনা-আপনিই আসিয়া পড়িবে। তিনি যে প্রেমের বন্যা প্রবাহিত করিয়াছিলেন, তাহার প্রবল স্রোতোবেগমুখে অনেক অবাঞ্ছনীয় সামাজিক ব্যাপার বহুদূরে ভাসিয়া গিয়াছিল। তাই, পদকর্ত্তা গাহিতে পারিয়াছিলেন—"ব্রাহ্মণে চণ্ডালে করে কোলাকোলি কবে বা ছিল এ রঙ্গ॥"

সাধারণভাবে প্রকাশ্যে তিনি কিছু না বলিলেও তাঁহার ব্যক্তিগত আচরণ হইতে সমাজ-সংস্কারবিষয়ে কিছু কিছু শিক্ষা আমরা পাইতে পারি। সন্ন্যাসের পরে দেখা গিয়াছে, তিনি কোনও স্থানে উপস্থিত হইলে আহারের সময়ে—যদি হরিদাসঠাকুর সেস্থানে উপস্থিত থাকিতেন, তাহা হইলে—একই ঘরে আহারের জন্য তাঁহাকেও তিনি আহ্বান করিতেন। অবশ্য দৈন্যবশতঃ, বিশেষতঃ প্রভুর অবশেষের জন্য লোভ বশতঃ, হরিদাসঠাকুর সেই আহ্বান অঙ্গীকার করিতেন না; কিন্তু করিলে প্রভু যে ভোজন-স্থান ত্যাগ করিয়া যাইতেন, ইহা মনে করিলে তাঁহার অকপটতারই অমর্য্যাদা করা হইবে। হরিদাসঠাকুর ছিলেন যবনবংশ-সম্ভূত। প্রভু যখন মথুরায় গিয়াছিলেন, তখন এক সনৌড়িয়া ব্রাহ্মণের পাচিত এবং ভগবন্নিবেদিত প্রসাদান্নও তিনি গ্রহণ করিয়াছিলেন। সনৌড়িয়া অনাচরণীয়। আবার ভজনের অনুকূল দীক্ষাদিসম্বন্ধেও তিনি রায়-রামানন্দকে বলিয়াছেন—"কিবা বিপ্র কিবা শূদ্র ন্যাসী কেনে নয়। যেই কৃষ্ণতত্ত্ববেত্তা সেই গুরু হয়॥" তাঁহার অনুগত ভক্তগণ যে তাঁহার এই উক্তি কার্য্যে পরিণত করিয়াছিলেন, তাহার যথেষ্ট প্রমাণ এখনও বিদ্যমান। শ্রীলনরোত্তমদাসঠাকুর ছিলেন কায়স্থ, শ্রীলশ্যামানন্দঠাকুর সদ্গোপ, শ্রীলনরহরিসরকার-ঠাকুর ছিলেন বৈদ্য। তাঁহাদের প্রত্যেকেরই বহু ব্রাহ্মণ শিষ্য ছিলেন এবং এসমস্ত ব্রাহ্মণশিষ্যদের বংশধরগণ এখনও বর্ত্তমান এবং তাঁহারা তাঁহাদের আদিগুরুর পরিবারভুক্ত বলিয়াই এখনও পরিচিত। তিনি হরিদাসঠাকুরের দ্বারা নাম প্রচার করাইয়াছেন, কায়স্থ রামানন্দ-রায় দ্বারা অধ্যাত্ম-শাস্ত্র প্রচার করাইয়াছেন; এসমস্তও গুরুরই কাজ। ভজনসম্বন্ধেও তিনি বলিয়া গিয়াছেন—"শ্রীকৃষ্ণভজনে নাহি জাতি কুলাদি বিচার।" এবং কার্য্যতঃও তিনি তাহা দেখাইয়াছেন। তাঁহার প্রভাবে বহু মুসলমানও বৈষ্ণব-ধর্ম্মে দীক্ষিত হইয়াছিলেন। প্রভুর এ সমস্ত আচরণ হইতে সর্ব্ববিষয়ে অস্পৃশ্যতা এবং অনাচরণীয়তা বর্জ্জন সম্বন্ধে তাঁহার মনোভাব জানা যায়। বাস্তবিক, অস্পৃশ্যতা-বর্জ্জন-বিষয়ক আন্দোলনের বীজও কয়েক শতাব্দী পূর্ব্বে শ্রীমন্মহাপ্রভুই রোপণ করিয়া গিয়াছেন।

সাম্য। তিনি কেবল অস্পৃশ্যতাবর্জ্জনের বীজই বপন করিয়া যান নাই; সাম্যনীতিও প্রচার করিয়া গিয়াছেন। বর্ত্তমানে যে সাম্যের কথা প্রচারিত হইতেছে, তাহা অপেক্ষা প্রভুর সাম্য ছিল অনেক বেশী ব্যাপক। মানুষে-মানুষে যে ভেদ, তাহা দূর করার কথাই আমরা এখন শুনি। কিন্তু পরমোদার শ্রীমন্মহাপ্রভু জীবমাত্রের মধ্যেই ভেদজ্ঞান দূর করার নীতি প্রচার করিয়া গিয়াছেন। পূর্ব্বোল্লিখিত অস্পৃশ্যতাবর্জ্জন-ব্যাপারে তাঁহার আচরণে মানুষে-মানুষে ভেদ দূর করার কথা জানা গিয়াছে। আবার তিনি জীবত্বের ভূমিকায় দাঁড়াইয়া—সেই ভূমিকায় দাঁড়াইয়া জীবমাত্রের প্রতি দৃষ্টি দেওয়ার জন্য সকলকে আহ্বান করিয়া স্পষ্টভাবেই বলিয়া গিয়াছেন—চারিবর্ণের বা চারি আশ্রমের কেহ নই আমি (ধ্বনিতে—স্থাবর-জঙ্গমের মধ্যেও কেহ নই আমি), আমি সেই অখিল-রসামৃতসিন্ধু

গোপীভর্ত্তার দাসানুদাস (ইহাই জীবের স্বরূপ, সুতরাং জীবত্বের ভূমিকা)। "নাহং বিপ্রো ন চ নরপতির্নাপি বৈশ্যো ন শূদ্রো নাহং বর্ণী ন চ গৃহপতি র্নো বনস্থো যতির্বা। কিন্তু প্রোদ্যন্নিখিলপরমানন্দপূর্ণামৃতাব্ধের্গোপীভর্ত্তুঃ পদকমলয়ো র্দাসদাসানুদাসঃ॥" বস্তুতঃ, নিখিল-পরমানন্দপূর্ণামৃতাব্ধি ভগবানের চরণকমলের দাস আমিও এবং স্থাবর-জঙ্গমাত্মক অপর সকল জীবও—এই জ্ঞান যাঁহার চিত্তকে সমুদ্ভাসিত করিয়াছে, একমাত্র তাঁহার পক্ষেই সকলের প্রতি সত্যিকারের সমদৃষ্টি সম্ভব এবং একমাত্র তাঁহার পক্ষেই পরমপ্রীতিভরে সেই সমদৃষ্টি রক্ষা করা সম্ভব; কারণ, এই সমদৃষ্টির পশ্চাতে ভিত্তিরূপ থাকিবে পরমানন্দ-পরিপূর্ণ অমৃতের সমুদ্রতুল্য ভগবান্ এবং তাঁহার চরণকমলের মধু-আস্বাদনজনিত পরম-আনন্দ, আর থাকিবে—সকলেই সেই অমৃতের সমুদ্রে সাঁতার দিতেছে, সকলেই সেই চরণকমলের মধুর লোভে সেই দিকে আকৃষ্ট হইতেছে, সকলেরই উদ্দেশ্য সেই সর্ব্বজনসেব্যের অহৈতুকী সেবা, সকলেই তাঁহার চরণের সঙ্গে এবং পরস্পরের সঙ্গে এক নিত্য অচ্ছেদ্য পরম মধুর প্রীতির বন্ধনে আবদ্ধ—এইরূপ একটা অনুভূতি। এই অনুভূতিই সাম্যের ভাবকে স্বতঃস্ফূর্ত্ত করিয়া তুলিতে পারে। এই স্বতঃস্ফূর্ত্ত-সাম্যভাবের ইঙ্গিতই প্রভু দিয়া গিয়াছেন। ইহার তুলনায় যত্নকৃত বা কর্ত্তব্যবুদ্ধিজাত সাম্যভাব অনেক নিম্নস্তরের বস্তু। প্রকৃত সাম্যভাবের বীজও কয়েক শতাব্দী পূর্ব্বে শ্রীগৌরাঙ্গই রোপণ করিয়া গিয়াছেন।

সেবা। শ্রীমন্‌মহাপ্রভু বলিয়াছেন—"ভারতভূমিতে হৈল মনুষ্যজন্ম যার। জন্ম সার্থক কর করি পর-উপকার॥ ১।৯।৩৯॥" পরোপকারেই মনুষ্যজন্মের সার্থকতা। বাক্যদ্বারা, বুদ্ধিদ্বারা, অর্থদ্বারা, এমন কি যাহাতে জীবন-নাশের আশঙ্কা আছে, সেই কার্য্য দ্বারা বা জীবন দ্বারাও পরোপকার করিবে। "এতাবজ্জন্মসাফল্যং দেহিনামিহ দেহিষু। প্রাণৈরর্থৈ র্ধিয়া বাচা শ্রেয় আচরণং সদা॥ শ্রী, ভা, ১০।২২।৩৫॥" দুঃখ দূর করাই উপকার। সমস্ত দুঃখের মূল সংসার-বন্ধন হইতে মুক্তিলাভ করার সহায়তাই হইল সর্ব্বাপেক্ষা বড় উপকার। সর্ব্বপ্রযত্নে তাহাতো করিবেই; কিন্তু নিরন্নকে অন্নদান, বস্ত্রহীনকে বস্ত্রদান, বিপন্নকে বিপদ হইতে উদ্ধারের চেষ্টা-আদিরূপ ইহকালের ব্যাপারেও কায়মনোবাক্যে প্রাণীদিগের উপকার করা লোকের কর্ত্তব্য, বিষ্ণুপুরাণের শ্লোক উদ্ধৃত করিয়া প্রভু সেইরূপ অভিপ্রায়ই প্রকাশ করিয়াছেন—"প্রাণিনামুপকারায় যদেবেহ পরত্র চ। কর্ম্মণা মনসা বাচা তদেব মতিমান্ ভজেৎ॥ ৩।১২।৪৫॥" উপকার-চেষ্টার পশ্চাতে যেন কোনও স্বার্থানুসন্ধান না থাকে, কোনও উপকার-প্রার্থী যেন বিমুখ হইয়া না যায়, তাহা বুঝাইবার জন্য তিনি বৃক্ষের দৃষ্টান্তের অবতারণা করিয়াছেন। "সর্ব্বপ্রাণীর উপকার হয় বৃক্ষ হৈতে॥ ১।৯।৪১॥ অহো এষাং বরং জন্ম সর্ব্বপ্রাণ্যুপজীবিনাম্। সুজনস্যেব যেষাং বৈ বিমুখা যান্তি নার্থিনঃ। শ্রী, ভা, ১০।১২।৩৩॥ বৃক্ষ যেন কাটিলেহ কিছু না বোলয়। শুখাইয়া মৈলে কারে পানি না মাগয়॥ যেই যে মাগয়ে তারে দেয় আপন ধন। ঘর্ম্মবৃষ্টি সহে আনের করয়ে রক্ষণ॥ ৩।২০।১৮-১৯॥"

প্রভু নিজেও কাঙ্গালদিগকে পরিতৃপ্তির সহিত ভোজন করাইয়া দরিদ্রসেবার আদর্শ স্থাপন করিয়াছেন। "প্রভুর আজ্ঞায় গোবিন্দ দীন হীন জনে। দুঃখিত কাঙ্গাল আনি করাইল ভোজনে॥ কাঙ্গালের ভোজনরঙ্গ দেখে গৌরহরি। 'হরিবোল' বলি তারে উপদেশ করি॥ 'হরি হরি' বোলে কাঙ্গাল প্রেমে ভাসি যায়। ঐছন অদ্ভুত লীলা করে গৌররায়॥ ২।১৪।৪২-৪৪॥"

পরোপকারের ব্যাপারে উপকারকের মনে যদি অহঙ্কারের ভাব আসে, "আমি অনুগ্রাহক, যাদের উপকার করিতেছি, তারা আমার অনুগ্রাহ্য"—এইরূপ একটা ভাব যদি চিত্তে জাগে, তাহা হইলে উপকারের বা সেবার তাৎপর্য্যই নষ্ট হইয়া যায় এবং উপকারী ও উপকৃত উভয়ের চিত্তেই মালিন্যের সঞ্চার হয়। উপকারী নিজের মনে পোষণ করিবেন—নিজের সম্বন্ধে সেবক-ভাব এবং অপরের সম্বন্ধে সেব্য-ভাব। তাহা হইলেই সেবা সার্থক হইবে। এই ভাবটী যাহাতে রক্ষিত হইতে পারে, তদুদ্দেশ্যে প্রভু বলিয়াছেন—"জীবে সম্মান দিবে জানি কৃষ্ণের অধিষ্ঠান॥ ৩।২০।২০॥" মনুষ্য-পশু-পক্ষি-কীট-পতঙ্গাদি স্থাবর-জঙ্গম প্রত্যেক জীবের মধ্যেই পরমাত্মারূপে ভগবান্ বিরাজিত; সুতরাং প্রত্যেক জীবই, বা প্রত্যেক জীবের দেহই, হইল ভগবানের শ্রীমন্দির-তুল্য; ভক্তের নিকটে ভগবন্মন্দির যেমন শ্রদ্ধা ও পূজার বস্তু, তদ্রূপ প্রত্যেক জীবকেই তেমনি শ্রদ্ধা ও পূজার পাত্র মনে করিবে এবং

চিত্তে এই ভাব পোষণ করিয়াই সেবার বা পরোপকারের কাজে লিপ্ত হইবে। তাহা হইলে নিজের সম্বন্ধে অনুগ্রাহকত্বের এবং সেব্যের সম্বন্ধে অনুগ্রাহ্যত্বের ভাব আসিয়া চিত্তকে কলুষিত করিতে পারিবে না, সেবাকেও অসার্থক করিতে পারিবে না। "ইঁহার সেবার সৌভাগ্য লাভ করিয়া আমি কৃতার্থ হইলাম"—এইরূপ ভাবই সেবাকে তখন মহনীয়তা দান করিবে। মহাপ্রভু এই জাতীয় সেবার আদর্শের কথাই বলিয়াছেন।

অহিংসা। ভারতবর্ষে অহিংসা একটা নূতন কথা নয়। আর্য্য-ঋষিগণ বহু সহস্র বৎসর পূর্ব্বেই অহিংসার প্রশংসা করিয়া গিয়াছেন। শ্রীমন্ মহাপ্রভুও বলিয়া গিয়াছেন, কাহাকেও হিংসা করাতো দূরে, "প্রাণিমাত্রে মনোবাক্যে উদ্বেগ না দিবে॥ ২।২২।৬৬॥" দেহের কথা তো দূরে, বাক্যদ্বারাও কাহারও উদ্বেগ জন্মাইবে না; কাহারও উদ্বেগ জন্মাইবার কথা কখনও মনেও চিন্তা করিবে না। প্রভুর এই উপদেশ চৌষট্টি অঙ্গ সাধনভক্তির অন্তর্ভুক্ত; সুতরাং ইহা ভজনাঙ্গ—অবশ্য প্রতিপাল্য—ইহাই প্রভুর অভিপ্রায়। কৃষ্ণের অধিষ্ঠান মনে করিয়া যাহাকে সম্মান করার কথা, তাহার প্রতি হিংসাচরণের প্রশ্নই উঠিতে পারে না। "যে তোমার হিংসা করিবে, তোমার অনিষ্ট করিবে, তাহাকেও তুমি হিংসা করিবে না, তাহার অনিষ্ট-চিন্তাও তুমি করিবে না; বরং যথাসাধ্য তাহার উপকারই করিবে"—এইরূপই প্রভুর উপদেশ। এবিষয়ে বৃক্ষধর্ম্মী হওয়াই সঙ্গত। "বৃক্ষ যেন কাটিলেহ কিছু না বোলয়। যেই যে মাগয়ে তারে দেয় আপন ধন। ঘর্ম্মবৃষ্টি সহে, করে আনের রক্ষণ॥ ৩।২০।১৯॥" যে লোক বৃক্ষের ডাল কাটে, বৃক্ষ তাহাকেও ছায়া দেয়, ফল-ফুল দেয়; নিজের অঙ্গরূপ ডালটীও দেয়। তাহার হিংসা করে না।

সহিষ্ণুতা। সহিষ্ণুতা সম্বন্ধে প্রভুর বিশেষ উপদেশ। "তরোরিব সহিষ্ণুনা"—গাছের মত সহিষ্ণু হইবে। বৃক্ষ ঝড়-বৃষ্টি-রৌদ্র অবিচলিত ভাবে সহ্য করে; জীবকৃত কত উৎপীড়নও সহ্য করে; ডাল কাটে, পাতা ছিঁড়ে, ফল নেয়,—কাহাকেও কিছু বলে না। মানুষকেও এইরূপ সহিষ্ণু হইতে হইবে। "অপরের অত্যাচার, উৎপীড়ন, দুর্ব্ব্যবহার—আমারই উপার্জ্জিত, আমারই পূর্ব্বজন্মকৃত কর্ম্মের ফল, সুতরাং আমারই প্রাপ্য; ইঁহারা উপলক্ষ্যমাত্র, ইঁহাদের যোগে আমার স্বোপার্জ্জিত কর্ম্মফলই আমার নিকট উপস্থিত হইয়াছে; ইঁহাদের দোষ কিছুই নাই, বরং আমার উপার্জ্জিত কর্ম্মফলগুলি ভোগ করিবার সুযোগ দিয়া ইঁহারা আমার উপকারই করিতেছে, আমার কর্ম্মফলের দুর্ব্বহ বোঝা কিছু কমাইয়া দিতেছে"—এইরূপ চিন্তা করিয়া অম্লানবদনে সমস্ত সহ্য করিবে। "ঐহিকং তু সদা ভাব্যং পূর্ব্বাচরিতকর্ম্মণা॥ পদ্মপু, পা, ৫১।২৬॥ ভুঞ্জান এব আত্মকৃতবিপাকম্ ॥ শ্রীভা, ১০।১৪।৮॥"

স্বাবলম্বিতা। অপরের গলগ্রহ না হওয়া, স্বাবলম্বী হওয়াই প্রভুর অভিপ্রেত ছিল। প্রভুর উপদেশে সুবুদ্ধিরায়-নামক নবদ্বীপের বিখ্যাত ব্রাহ্মণ জমিদার যখন ভজনের উদ্দেশ্যে শ্রীবৃন্দাবনে গিয়াছিলেন, তখন তিনি ভিক্ষাবৃত্তি অবলম্বন না করিয়া বন হইতে কাষ্ঠ আহরণ করিয়া তাহা বিক্রয় করিয়া জীবিকা নির্ব্বাহ করিতেন। প্রভু বলিতেন, যে পরের অপেক্ষা রাখে, তার ইহকাল-পরকাল দুইই নষ্ট হয়, কৃষ্ণও তাকে উপেক্ষা করেন। "নিরপেক্ষ না হৈলে ধর্ম্ম না যায় রক্ষণে॥ ৩।৩।২২॥ বৈরাগী হইয়া যেবা করে পরাপেক্ষা। কার্য্যসিদ্ধি নহে কৃষ্ণ করেন উপেক্ষা॥ ৩।৬।২২২॥"

প্রীতি ও মৈত্রী। প্রীতিই ছিল মহাপ্রভুর সমস্ত শিক্ষার প্রাণবস্তু। ভগবৎ-প্রীতি হইল তাঁহার প্রচারিত ধর্ম্মের প্রাণ এবং সেই প্রীতির প্রতিফলনই হইল জাগতিক প্রীতি। প্রীতি প্রীতিকে আকর্ষণ করিয়া অভিব্যক্ত করে, সমস্ত সমস্যার সমাধান করিয়া দিতে পারে, বহুক্ষেত্রে প্রভু তাহা দেখাইয়া গিয়াছেন। জগাই-মাধাই ছিল নবদ্বীপে দুর্দ্দান্ত অত্যাচারী, মদ্যপ। তাহাদের ভয়ে কেহ রাস্তায় বাহির হইতে সাহস করিত না। শ্রীমন্নিত্যানন্দ গেলেন তাহাদিগকে হরিনাম শুনাইতে; তাহারা তাঁহাকে প্রহার করিল। নিতাই তাতে ক্রুদ্ধ হইলেন না, তাদের প্রতি আরও প্রীতি প্রদর্শন করিতে লাগিলেন। ফলে তাহারা তাঁহার পদানত হইল, গৌরের পরম ভক্ত হইয়া ধন্য হইল। রাজনৈতিক ব্যাপারেও প্রীতির প্রভাব যে গুরুতর সমস্যারও সমাধান করিতে পারে, প্রভুর লীলায় তাহারও প্রমাণ পাওয়া যায়। তিনি নীলাচল হইতে গৌড়ে আসিতেছেন;

সঙ্গে রাজা-প্রতাপরুদ্রের উচ্চপদস্থ কর্ম্মচারীও কয়েকজন আসিয়াছিলেন, তাঁহার রাজ্যের সীমা পর্য্যন্ত। এই সীমার পরেই এক যবন-রাজার রাজত্ব; তখন প্রতাপরুদ্রের সঙ্গে তাঁহার যুদ্ধ চলিতেছিল। গৌড়ে আসিতে হইলে তাঁহার রাজ্যের ভিতর দিয়া আসিতে হয়। যুদ্ধের জন্য তাহা নিরাপদ ছিল না। তাই, প্রতাপরুদ্রের অমাত্যবর্গ বলিলেন, যবনরাজের সঙ্গে সন্ধি করিতে হইবে, নচেৎ অগ্রসর হওয়া সম্ভব হইবে না। সন্ধি লইল—চিরকালের জন্য যুদ্ধবিরতি এবং উভয় রাজ্যের মধ্যে প্রীতি প্রতিষ্ঠিত হইল। কিন্তু এই সন্ধি রাজায় রাজায় নয়, কোনও দলিলপত্রে নয়; এই সন্ধি হইয়াছিল—গৌরের এবং যবনরাজের, হৃদয়ের সঙ্গে প্রীতির বন্ধনে। মধ্যস্থও হইয়াছিল প্রেমাবতার শ্রীশ্রীগৌরসুন্দরের সার্ব্বজনীন প্রেম, অপর কেহও নহে, অপর কিছুও নহে। গৌরসুন্দরের সর্ব্বচিত্তাকর্ষিণী প্রীতিই যবনরাজের চিত্তকে আকৃষ্ট করিয়া তাঁহার পদানত করিয়া দিয়াছিল। তখন তিনি নিজেই রক্ষক হইয়া গৌরসুন্দরকে একটা বিপদসঙ্কুল নদী পার করিয়া দিলেন এবং এই সেবার সুযোগ পাইয়া নিজেকে কৃতার্থ জ্ঞান করিলেন। তদবধি তাঁহার পূর্ব্বশত্রু রাজা-প্রতাপরুদ্রও তাঁহার পরম বান্ধবে পরিণত হইলেন। প্রীতির এমনি প্রভাব—তাহা প্রভু দেখাইয়া গিয়াছেন।

বিচার ও আলোচনা। গৃহস্থাশ্রমে থাকিবার সময়েই শ্রীমন্মহাপ্রভু যখন নদীয়ানগরে কীর্ত্তন প্রচার করিতেছিলেন, তখন একদিন মহাসঙ্কীর্ত্তন লইয়া তিনি নবদ্বীপের স্থানীয় শাসনকর্ত্তা কাজীসাহেবের বাড়ীতে গিয়াছিলেন। সেস্থানে তাঁহার সহিত গোবধ-সম্বন্ধে প্রভুর বিচারমূলক আলোচনা হইয়াছিল।

সন্ন্যাসের পরে নীলাচলে শ্রীপাদ বাসুদেব-সার্ব্বভৌমের সঙ্গে এবং বারাণসীতে শ্রীপাদ প্রকাশানন্দ-সরস্বতী-প্রমুখ সন্ন্যাসীদিগের সঙ্গে বেদান্তের শঙ্করভাষ্য সম্বন্ধে প্রভুর বিচার হয়। শ্রীপাদ শঙ্করাচার্য্য লক্ষণাবৃত্তিতে শ্রুতির অর্থ করিয়া বেদান্তের ভাষ্য লিখিয়াছেন। মহাপ্রভু বলেন, মুখ্যাবৃত্তিতে অর্থ করিলেই শ্রুতির প্রকৃত অর্থ পাওয়া যায়; লক্ষণায় তাহা পাওয়া যায় না। বিশেষতঃ, লক্ষণাতে অর্থ করিতে গেলে শ্রুতির স্বতঃপ্রমাণতার হানি হয়। মহাপ্রভু শ্রীপাদ শঙ্করের লক্ষণার্থ খণ্ডন করিয়া বেদান্তসূত্রের মুখ্যার্থ প্রকাশ করেন। এই প্রসঙ্গে তিনি মুখ্যতঃ (১) ব্রহ্মের নির্ব্বিশেষত্ব খণ্ডন করিয়া সবিশেষত্ব, ষড়ৈশ্বর্য্যপূর্ণত্ব ও স্বয়ংভগবত্ত্বা, (২) জীব-ব্রহ্মের অভেদত্ব খণ্ডন করিয়া জীবের অণুত্ব, ব্রহ্মশক্তিকত্ব এবং নিত্যকৃষ্ণদাসত্ব, (৩) ভগবদ্‌বিগ্রহের মায়িক-স্বাত্ত্বিক-বিকারত্ব খণ্ডনপূর্ব্বক সচ্চিদানন্দঘনত্ব, (৪) সৃষ্টি-ব্যাপারে বিবর্ত্তবাদ-খণ্ডন পূর্ব্বক পরিণামবাদ এবং (৫) তত্ত্বমসিবাক্যের মহাবাক্যত্ব খণ্ডনপূর্ব্বক প্রণবের মহাবাক্যত্ব স্থাপন করিয়াছেন। তিনি আরও প্রতিপন্ন করিয়াছেন যে, (৬) শ্রীকৃষ্ণই পরমব্রহ্ম, (৭) শ্রীকৃষ্ণই সমস্ত বেদের সম্বন্ধতত্ত্ব, (৮) ভক্তিই অভিধেয়-তত্ত্ব, (৯) প্রেমই প্রয়োজন-তত্ত্ব, (১০) সেব্য-সেবকত্বই ব্রহ্ম ও জীবের মধ্যে সম্বন্ধ এবং শ্রীকৃষ্ণসেবাই জীবের চরমতম কাম্য, সাযুজ্যমুক্তি নহে।

দাক্ষিণাত্য-ভ্রমণকালে গোদাবরীতীরে শ্রীল রায়রামানন্দের সঙ্গে তিনি সাধ্য-সাধন-তত্ত্বের আলোচনা করেন। এই আলোচনায় রায় ছিলেন বক্তা এবং প্রভু ছিলেন প্রশ্নকর্ত্তা ও শ্রোতা। শ্রীরাধার প্রেমই যে সাধ্য-শিরোমণি এবং রাগানুগামার্গের ভজনেই যে এই প্রেমের আনুগত্যময়ী সেবা পাওয়া যাইতে পারে, তাহাই এই আলোচনায় প্রকাশিত হইয়াছে।

দাক্ষিণাত্য-ভ্রমণকালে শ্রীরঙ্গক্ষেত্রে শ্রীল বেঙ্কটভট্টের সঙ্গে প্রভু চাতুর্ম্মাস্যের চারিমাস অবস্থান করেন। বেঙ্কটভট্ট ছিলেন শ্রীপাদ রামানুজাচার্য্য-প্রবর্ত্তিত শ্রী-সম্প্রদায়ী বৈষ্ণব—শ্রীলক্ষ্মী-নারায়ণের উপাসক। তাঁহার ভক্তি-নিষ্ঠা দেখিয়া প্রভু ভট্টকে অত্যন্ত প্রীতি করিতেন; ভট্টেরও প্রভুর প্রতি অত্যন্ত ভক্তি ছিল। উভয়ের মধ্যে সখ্যভাব গাঢ় হইয়া উঠিয়াছিল। উভয়ের মধ্যে ভজনীয় বিষয় সম্বন্ধে প্রায়শঃই ইষ্টগোষ্ঠী হইত। এক সময়ে এই ইষ্টগোষ্ঠী-প্রসঙ্গে শাস্ত্রপ্রমাণ অনুসারে তাঁহারা সিদ্ধান্ত করিলেন যে, শ্রীকৃষ্ণ এবং শ্রীনারায়ণ স্বরূপে অভিন্ন হইলেও সৌন্দর্য্যে, মাধুর্য্যে এবং লীলারস-বৈচিত্রীতে শ্রীনারায়ণ অপেক্ষা শ্রীকৃষ্ণেরই সর্ব্বাতিশায়ী উৎকর্ষ। তাই নারায়ণের বক্ষোবিলাসিনী লক্ষ্মীদেবীও ব্রজে শ্রীকৃষ্ণের সেবা পাওয়ার লোভে কঠোর তপস্যা করিয়াছিলেন। অবশ্য লক্ষ্মী-দেহে

তিনি তাঁহার অভীষ্টসেবা পান নাই; কিন্তু প্রভু বলিলেন—"কৃষ্ণ-নারায়ণ যৈছে একই স্বরূপ। গোপী-লক্ষ্মী ভেদ নাহি, হয় একরূপ॥ গোপীদ্বারা লক্ষ্মী করে কৃষ্ণসঙ্গাস্বাদ। ঈশ্বরত্বে ভেদ মানিলে হয় অপরাধ॥ একই ঈশ্বর ভক্তের ধ্যান-অনুরূপ। একই বিগ্রহে ধরে নানাকার রূপ॥ ২।৯।১৩৯-৪১॥" ইহা শ্রুতির সেই "একোঽপি সন্ যো বহুধা বিভাতি।"—উক্তিরই প্রতিধ্বনি।

দাক্ষিণাত্য-ভ্রমণকালে বৌদ্ধাচার্য্যদের সহিতও প্রভুর তত্ত্ব-বিচার হইয়াছিল। প্রভু বৌদ্ধাচার্য্যদের মত খণ্ডন করিয়া স্বীয় মতের প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন।

দাক্ষিণাত্যে শ্রীপাদ মধ্বাচার্য্যের অনুগত তত্ত্ববাদীদের সহিতও সাধ্য-সাধনসম্বন্ধে প্রভুর আলোচনা হইয়াছিল। তত্ত্ববাদী আচার্য্য বলিয়াছিলেন—"বর্ণাশ্রমধর্ম্ম কৃষ্ণে কর্ম্মার্পণ। এই হয় কৃষ্ণভক্তের শ্রেষ্ঠ সাধন॥ পঞ্চবিধ মুক্তি পাইয়া বৈকুণ্ঠে গমন। সাধ্যশ্রেষ্ঠ হয় এই শাস্ত্র নিরূপণ॥ ২।৯।২৩৮-৩৯॥" ইহা হইতে জানা যায়, মধ্বাচারী সম্প্রদায়ের মতে সালোক্যাদি চতুর্ব্বিধা মুক্তিই সাধ্য এবং বর্ণাশ্রম-ধর্ম্মের অনুষ্ঠানপূর্ব্বক কৃষ্ণে কর্ম্মার্পণই তাহার সাধন। ইহার উত্তরে প্রভু বলিলেন—"শাস্ত্রে কহে 'শ্রবণ-কীর্ত্তন। কৃষ্ণপ্রেম-সেবা ফলের পরম সাধন॥' শ্রবণ-কীর্ত্তন হৈতে কৃষ্ণে হয় প্রেমা। সেই পরম-পুরুষার্থ—পুরুষার্থসীমা॥ কর্ম্মত্যাগ, কর্ম্মনিন্দা—সর্ব্বশাস্ত্রে কহে। কর্ম্ম হৈতে কৃষ্ণপ্রেমভক্তি কভু নহে॥ পঞ্চবিধ মুক্তি ত্যাগ করে ভক্তগণ। ফল্গু করি মুক্তি দেখে নরকের সম॥ কর্ম্মমুক্তি দুই বস্তু ত্যজে ভক্তগণ। সন্ন্যাসী দেখিয়া আমা করহ বঞ্চন॥ এইত বৈষ্ণবের নহে সাধ্য-সাধন। সেই দুই স্থাপ তুমি সাধ্য-সাধন॥ ২।৯।২৪০-৪৫॥" প্রভু বলিলেন—কৃষ্ণপ্রেমই পরম-পুরুষার্থ, চতুর্ব্বিধা মুক্তি নয়; আর শ্রবণ-কীর্ত্তনাদি নববিধা ভক্তিই তাহার সাধন, বর্ণাশ্রমধর্ম্মের অনুষ্ঠানপূর্ব্বক কৃষ্ণে কর্ম্মার্পণ নয়। শুনিয়া তত্ত্ববাদী আচার্য্য বলিলেন—"তুমি যেই কহ সেই সত্য হয়। সর্ব্বশাস্ত্রে বৈষ্ণবের এই সুনিশ্চয়॥ তথাপি মধ্বাচার্য্য যে করিয়াছে নির্ব্বন্ধ। সেই আচরিয়ে সভে সম্প্রদায় সম্বন্ধ॥ ২।৯।২৪৭-৪৮॥"

এস্থলে দেখা গেল, গৌড়ীয়-বৈষ্ণব-সম্প্রদায়ের সঙ্গে মধ্বাচারী-সম্প্রদায়ের সাধন-বিষয়েও মিল নাই, সাধ্য-বিষয়েও মিল নাই। বেদান্তমত-বিষয়েও এই দুই সম্প্রদায়ের মধ্যে মিল নাই। শ্রীমন্ মধ্বাচার্য্য ছিলেন ভেদবাদী, আর গৌড়ীয়-বৈষ্ণব-সম্প্রদায় হইলেন অচিন্ত্য-ভেদাভেদবাদী।

রামানুজাচার্য্য-প্রবর্ত্তিত শ্রীসম্প্রদায় শ্রীশ্রীলক্ষ্মীনারায়ণের উপাসক; তাঁহাদের কাম্যও বৈকুণ্ঠপ্রাপ্তি। মধ্বাচারী সম্প্রদায়ের কাম্যও বৈকুণ্ঠপ্রাপ্তি—সালোক্যাদি মুক্তি। এই দুই সম্প্রদায়েরই কাম্য বৈকুণ্ঠপ্রাপ্তি হওয়া সত্ত্বেও ইঁহারা দুই ভিন্ন সম্প্রদায়ভুক্ত; যেহেতু ইঁহাদের বৈদান্তিক মত ভিন্ন। রামানুজ বিশিষ্টাদ্বৈতবাদী, আর মধ্বাচার্য্য ভেদবাদী। ইহাতে বুঝা যায়, বৈদান্তিক মতের পার্থক্যই সম্প্রদায়-পার্থক্যের হেতু। চারিটী অনুমোদিত বৈষ্ণব-সম্প্রদায় আছে—শ্রী (রামানুজ), ব্রহ্ম (মধ্বাচার্য্য), রুদ্র (বিষ্ণুস্বামী) এবং চতুঃসন (নিম্বাদিত্য)। ইঁহাদের বৈদান্তিক মত ভিন্ন ভিন্ন। তাই ইঁহারা ভিন্ন ভিন্ন সম্প্রদায়। গৌড়ীয়-বৈষ্ণবদের বৈদান্তিক মত এই চারি সম্প্রদায়ের মত হইতে পৃথক্। সুতরাং বৈদান্তিক মতের পার্থক্যই সম্প্রদায়ের বিভিন্নতার হেতু হইলে, গৌড়ীয়-সম্প্রদায়ও একটী পৃথক্ সম্প্রদায়রূপে পরিগণিত হওয়ারই কথা। তাহা হইলে প্রশ্ন উঠিতে পারে—গৌড়ীয়-সম্প্রদায় একটী পৃথক্ সম্প্রদায় হইলে উল্লিখিত চারিটী সম্প্রদায়ের ন্যায় এই সম্প্রদায়ও অনুমোদিত সম্প্রদায় বলিয়া পরিগণিত হইবেন কিনা। তাহাতে কোনও বাধা আছে বলিয়া মনে হয় না। কারণ, উক্ত চারিটী সম্প্রদায় পরস্পর পৃথক্ হইলেও তাঁহাদের একটা সাধারণ ভূমিকা আছে—সেব্য-সেবকভাব এবং এই সেব্য-সেবক ভাবই ইঁহাদের অনুমোদিত হওয়ার হেতু। গৌড়ীয়-সম্প্রদায়েও সেব্য-সেবক ভাব বর্ত্তমান। সুতরাং গৌড়ীয়-সম্প্রদায়ও অনুমোদিত না হওয়ার কোনও হেতু থাকিতে পারে না।

শ্রীপাদ বলদেব বিদ্যাভূষণ তাঁহার প্রমেয়রত্নাবলীর এবং গোবিন্দভাষ্যের প্রারম্ভে স্বীয়-গুরুপ্রণালিকা লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। তাহা হইতে জানা যায়, লৌকিক-লীলায় শ্রীমন্মহাপ্রভুর পরমগুরু শ্রীপাদ মাধবেন্দ্রপুরী-গোস্বামীও শ্রীমন্মধ্বাচার্য্যের শিষ্যানুশিষ্যপর্য্যায়-ভুক্ত। ইহাতে যদি কেহ গৌড়ীয়-সম্প্রদায়কে মধ্বাচারী সম্প্রদায়ভুক্ত বলিতে

চাহেন, তবে তাহা হইবে কেবল গুরুপরম্পরাগত **সম্প্রদায়-ভুক্তি**। সম্প্রদায়-বিভাগের প্রাচীন ভিত্তি কিন্তু বৈদান্তিক মত। পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে—মধ্বাচারী সম্প্রদায়ের সাধ্য, সাধন এবং বৈদান্তিক মত, গৌড়ীয় সম্প্রদায়ের সাধ্য, সাধন এবং বৈদান্তিক মত হইতে পৃথক। অধিকন্তু তাহা শ্রীমন্‌মহাপ্রভুর অনুমোদিতও নহে।

যাহা হউক, শ্রীবৃন্দাবন হইতে প্রত্যাবর্ত্তনের পথে এক পাঠান পীরের সঙ্গেও কোরাণের প্রতিপাদ্য বিষয় সম্বন্ধে শ্রীমন্ মহাপ্রভুর বিচার হইয়াছিল। প্রভু বলিয়াছিলেন—কোরাণের প্রতিপাদ্য হইলেন সবিশেষ ব্রহ্ম, অভিধেয় হইল ভক্তি এবং প্রয়োজন হইল ভগচ্চরণে প্রীতি। প্রভুর কৃপায় সপার্ষদ পাঠান পীর বৈষ্ণবধর্ম্ম গ্রহণ করিয়া ধন্য হইয়াছিলেন।

সাম্প্রদায়িকতার অভাব। প্রভুর উপদেশের এবং আচরণের আদর্শে একটী সম্প্রদায় গঠিত হইয়া থাকিলেও তাঁহার মধ্যে সাম্প্রদায়িক সঙ্কীর্ণতা ছিলনা। শ্রীপাদ শঙ্করাচার্য্য প্রবর্ত্তিত জ্ঞানমার্গ-সম্প্রদায়ের সাধ্য এবং সাধন ভক্তিবিরোধী হইলেও দাক্ষিণাত্য-ভ্রমণের সময়ে প্রভু "সিংহারি মঠে আইলা শঙ্করাচার্য্য স্থানে॥ ২।৯।২২৭॥" (গৌড়ীয়-সম্প্রদায়ের অসাম্প্রদায়িকতা একটী স্বতন্ত্র প্রবন্ধে আলোচিত হইবে)।

বৈষ্ণব লেখকগণ মুখ্যভাবে প্রভুর শিক্ষা এবং আচরণেরই বিবরণ দিতে চেষ্টা করিয়াছেন। ঐতিহাসিক দিক্‌টায় তাঁহারা বিশেষ মনোযোগ দেন নাই। তাঁহার চরিতের ঐতিহাসিক তথ্য আবিষ্কৃত হইলে সম্ভবতঃ অনেক নূতন বিষয় জানা যাইবে এবং লৌকিক-সমাজের কোন্ কোন্ দিকে তাঁহার প্রভাব কিভাবে ক্রিয়া করিয়াছিল, তাহাও জানা যাইবে। এসকল বিষয়ে কেহ যদি অনুসন্ধান করেন, তাহা হইলে বাঙ্গালার একটা লুপ্ত সম্পদও হয়তো আবিষ্কৃত হইতে পারে।

তাঁহার লীলায় এবং উপদেশে প্রভু ধর্ম্ম-সম্বন্ধে যে সমস্ত তত্ত্ব প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন, পরবর্ত্তী প্রবন্ধসমূহে আমরা তাহার দিগ্‌দর্শন দিতে চেষ্টা করিব।